KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৯/৪ ৪৯/৫ ৪৯/৬ ৪৯/৭	Year of Publication শ্রাবণ ১৩৯৫ // Aug 1988 ভাদ্র ১৩৯৫ // Sep 1988 আশ্বিন ১৩৯৫ // Oct 1988 কার্তিক ১৩৯৫ // Nov 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

CD Roll No KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা সেপটেম্বর ১৯৮৮

ভারত উপমহাদেশে পাঁচটি বড় কৃষকবিদ্রোহের সংগঠন আর প্রকৃতি ধর্মচেতনার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী তা বিশ্লেষণ করেছেন "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন" নিবন্ধে। দীর্ঘ এই রচনা এখন থেকে আগামী কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

বিধবাবিবাহের প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের প্রতিরোধে আজীবন সংগ্রামী, ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের যথার্থ পথিকৃৎ হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টারের গবেষক সন্তোষকুমার অধিকারী।

ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কৌতূহলোদ্দীপক নিবন্ধ—"সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগ।"

মোহিতলাল মজুমদার কী করে তাঁর জীবনপ্রেমিক কবিসত্তা বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত গভীর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তারই বিশ্লেষণ নিয়ে আজহারউদ্দিন খানের সন্দর্ভ—"শতাব্দীর প্রেক্ষিতে মোহিত-প্রতিভার বিচার।"

এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে থাকছে দক্ষিণভারতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রমুখ প্রবক্তা বাসব প্রেমানন্দের বিশ্বাস ও সংগ্রামের বিবরণ।

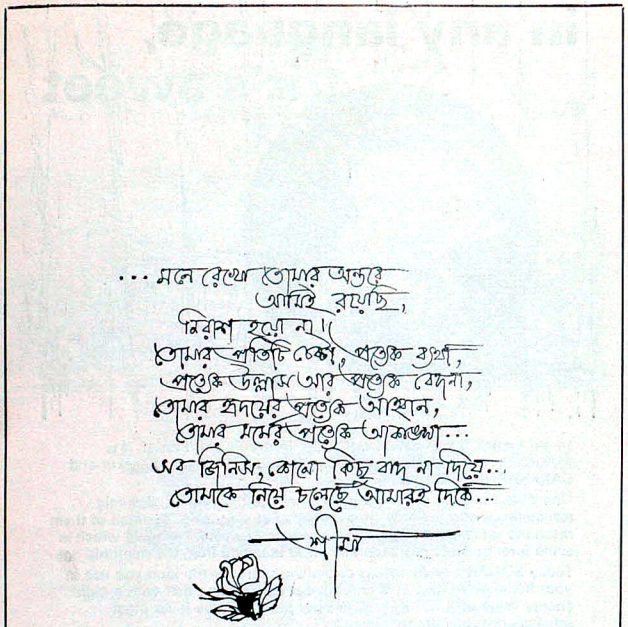

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৫
সেপটেম্বর ১৯৮৮
ভাদ্র ১৩৯৫

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৩৭৩
নারীর মুক্তি ও বিদ্যাসাগর সন্তোষকুমার অধিকারী ৩৯৪
শতাব্দীর প্রেক্ষিতে মোহিতলালের প্রতিভার বিচার আজহারউদ্দীন খান ৪১২
সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে? শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৪২১

১৫ই এলে ফিরে দেখা নিখিলকুমার নন্দী ৩৮৯
শতাব্দী শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৩৯১
আগ্নেহননের কারাগারে খসরু পারভেজ ৩৯২
মশারির নীচে তরুণ মুখোপাধ্যায় ৩৯৩

বৃত্তরেখা রফিউদ্দীন ৪০৩

গ্রন্থসমালোচনা ৪২৮
সনাতন মিত্র, রণেন্দ্রনাথ দেব, মহাশ্বেতা চৌধুরী, কামাল হোসেন

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৪৩৯
বেদনা কী ভাষায় রে অশোক বাগচী

স্মৃতিচারণ ৪৪২
কত যে সুখের স্মৃতি : বিভূতিভূষণ করুণাময় মুখোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার ৪৪৭
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা প্রেমানন্দের মুখোমুখি দীপক

স্মরণে ৪৫৫
রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী অমলেন্দু দে

মতামত ৪৫৮
কল্যাণকুমার দত্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা, সংগীত ও নৃত্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের চিত্তাকর্ষক বিবরণ ও সরস স্মৃতিকথাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি-বিধৃত এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের অবশ্যপাঠ্য। সুন্দর প্রচ্ছদে, চিত্রে ও রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিচিত্রে অলংকৃত।

অজিতকুমার চক্রবর্তী	॥	**কাব্যপরিক্রমা** ১০·০০, **রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ	॥	**ঘরোয়া** ১৫·০০, **জোড়াসাঁকোর ধারে** ১৮·০০
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	॥	**রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম** ৮·০০
উইলিয়াম পিয়ার্সন	॥	**শান্তিনিকেতন-স্মৃতি** ৮·০০
চিন্মোহন সেহানবীশ	॥	**রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ** ৩৫·০০
প্রতিমা দেবী	॥	**নির্বাণ** ৬·০০
প্রমথনাথ বিশী	॥	**রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন** ২৮·০০
শ্রীরানী চন্দ	॥	**আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ** ১৬·০০, **গুরুদেব** ২৪·০০, **সব হতে আপন** ৩০·০০
মীরা দেবী	॥	**স্মৃতিকথা** ২২·০০
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	॥	**শান্তিনিকেতনের একযুগ** ২৪·০০
শ্রীশঙ্খ ঘোষ	॥	**নির্মাণ আর সৃষ্টি** ২৮·০০
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ	॥	**রবীন্দ্রসংগীত** ৪৫·০০
শ্রীশিবানী রায়	॥	**রবীন্দ্র উপন্যাসে পাশ্চাত্য অভিঘাত** ১৫·০০
শ্রীসুব্রত রায় চৌধুরী	॥	**রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়** ১৫·০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়-কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

এক

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে কৃষক-বিদ্রোহের সামগ্রিক রূপ বোঝানো যায় না, এর জন্য বিদ্রোহীদের মানসিকতা-বিশ্লেষণ অপরিহার্য—এ কথা এখন মোটেই নূতন নয়। বিদেশে এবং ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে।

বিদ্রোহের উদ্ভবে অর্থনৈতিক কারণের ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু বিদ্রোহের যৌথ সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র "প্রভু"-শ্রেণী সম্পর্কে কৃষকদের নিরুদ্ধ আক্রোশের ফল নয়। তাদের নানা বিশ্বাস আর ধারণা প্রতিরোধের সংকল্পকে প্রভাবিত করে। যেমন, একটা বিশ্বাস তাদের এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর শক্তির আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত। বিদ্রোহ এক অর্থে ক্ষমতার লড়াই; অবস্থাবিশেষে এ ক্ষমতার ক্ষেত্র কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও-বা ব্যাপক। প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় অনিবার্য, এ বিশ্বাস বিদ্রোহীদের সবক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত নাও করতে পারে। কিন্তু শত্রু অপ্রতিরোধ্য নয়, এ বিশ্বাস না থাকলে সংঘবদ্ধ আন্দোলন সহজে গড়ে ওঠে না। কৃষকদের বিচার বস্তুনিষ্ঠ নাও হতে পারে। হয়তো তাদের ক্ষমতাকে তারা বাড়িয়ে দেখেছে, বা শত্রুর ক্ষমতাকে যথাযথ মূল্য দেয় নি। ঐতিহাসিকের কাজ—এ বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি যাচাই করা নয়; কাজ—তাকে চিহ্নিত করা এবং যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা।

শুধুমাত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত বোঝার ক্ষেত্রেই কৃষকদের নানা বিশ্বাসের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। এ সিদ্ধান্ত কৃষক-আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। পরবর্তী-পর্যায়গুলির সঙ্গে কৃষকদের সাম্প্রতিক শ্রেণীসম্পর্কের সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ। প্রায়ই দেখা গেছে, বিদ্রোহীদের প্রথম ঘোষিত লক্ষ্য পরে অনেক পালটে গেছে।[১] যে ধারণার উপর কোনো-কোনো নূতন লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত, তার উৎস কৃষকদের অতীত দিনের যৌথ স্মৃতি; সে অতীত কোথাও-বা সুদূর, কোথাও নিকট। বহু বাস্তব অভিজ্ঞতা এ স্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে। কিন্তু তা-ই স্মৃতির একমাত্র উপাদান নয়। সুখ এবং সমৃদ্ধির জন্য কৃষকদের সহজাত আকাঙ্ক্ষা, অনিবার্য আশাভঙ্গ, নূতন স্বপ্ন রচনা, এবং আরো অনেক কিছু এ স্মৃতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। অতীতের প্রায়-বিস্মৃত এমন মুহূর্তও এমনভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই, কৃষকদের সাম্প্রতিক শ্রেণীসম্পর্ক

ও অতীত-চারণা, ইতিহাস-চেতনার একটি উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ যে ধারণা- এবং বিশ্বাস-প্রভাবিত হয়ে বিদ্রোহীরা তাদের লক্ষ্য স্থির করে, তা অত্যন্ত জটিল।

তা ছাড়া, যে-কোনো কৃষক-আন্দোলনের একটা বড়ো দিক—তার সংগঠন। কৃষকদের শ্রেণীসম্পর্কের বিশিষ্ট বিন্যাস প্রতিরোধের মূল গতি এবং ধারাকে নির্ধারিত করে; কিন্তু তার সংগঠন কৃষকদের যৌথ সমাজ-জীবনের নানা দিকের উপর নির্ভরশীল। এ সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নানা প্রাক্তন সংস্কার এবং বিশ্বাস। বিদ্রোহের বিশিষ্ট মুহূর্তগুলিতে নূতন বোধও উন্মেষিত হয়।

বিদ্রোহীদের এ জটিল মানসিকতা বিশ্লেষণের একটা অপরিহার্য দিক তার উৎসনির্দেশ। এ উৎস স্বভাবতই বহুমুখী। একটা প্রধান উৎস হিসেবে ধর্মচেতনার রূপবিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

"ধর্ম" কথাটি আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছি। ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি, তাদের নানা রূপ, বিকাশ, রূপান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা আছে; অনেক ক্ষেত্রে তারা পরস্পরবিরোধী। একটা বিষয়ে নানা ব্যাখ্যায় মোটামুটি মিল আছে। তা হল, ধর্ম-বিশ্বাসের কেন্দ্রে আছে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক কোনো শক্তির ধারণা, যে শক্তি মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে; এমন-কি, তার ধারাকে নির্ধারিত করে। "ভগবান" বলে কোনো অস্তিত্বকল্পনার সঙ্গে এ বিশ্বাসও যুক্ত হয়ে আছে যে, ভগবানের শক্তি মানুষের আয়ত্তবহির্ভূত। ভগবানের ঐশ্বর্য কোনো-কোনো মানুষে আরোপিত হতে পারে; এমন-কী মানুষও ভগবানে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু সেখানেও মূল বিশ্বাস—সে মানুষ বিশেষ একজন; সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—অতিমানব। এভাবেই একান্ত আটপৌরে জীবনের ব্যবহারের নানা জিনিস, প্রকৃতির নানা বস্তু, ধর্মীয় লক্ষণে মণ্ডিত হতে পারে। অনেক নৈতিক বিধান, আচার অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত নানা অনুশাসনও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সমপৃক্ত হতে পারে। তবে মানুষের প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি; তাই লৌকিক পরিবেশের ভিন্নতায় এ বিশ্বাসের রূপও পালটায়।

এ বিশেষ অর্থে কৃষক-বিদ্রোহে ধর্মচেতনার ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে এর কয়েকটা বিশেষ দিক প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। আগেই বলেছি, বিদ্রোহী কৃষকদের মানসিকতার উৎস বহুমুখী। অন্যান্য অনেক প্রভাবের সঙ্গে ধর্মচেতনাও নানাভাবে মিশে থাকে। যে ধর্ম-বিশ্বাস কৃষক-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, বহু ক্ষেত্রে তা কৃষকদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র। পুরনো ধর্মবিশ্বাস যদি থাকেও বা, তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে; বা কৃষকেরা সচেতনভাবে তার অংশ-বিশেষ বেছে নিয়েছে। তা ছাড়া, ধর্মচেতনার বিশিষ্ট ভূমিকা আন্দোলনের সব পর্যায়ে সমান থাকে নি। সাধারণত, এ ভূমিকা তখনই স্পষ্টভাবে দেখা গেছে, যখন বিদ্রোহী কৃষকেরা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পূর্ণ-ভাবে আস্থা হারিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাসের কথা ভেবেছে; কারণ তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ ছাড়া "প্রভু"-শ্রেণীর কর্তৃত্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ এ ধর্মচেতনার ভূমিকা এক বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সমপৃক্ত।

দুই

ধর্মের প্রভাবের দিক থেকে বিচার করলে দু ধরনের আন্দোলন দেখা যায়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ প্রভাব একান্তই সীমিত; এখানে ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা প্রধানত আন্দোলনের সংহতিরক্ষায়। দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলনে এ প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী এবং গভীর। এখানে বিদ্রোহের যৌথ সিদ্ধান্ত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সংগঠনের মূল শক্তি ধর্মপ্রভাবিত কোনো-কোনো বিশ্বাস। নেতার প্রতি অবিচল আনুগত্যের একটা প্রধান উৎস ধর্মীয় ধারণা। আন্দোলনের উপায় ও লক্ষ্যেও ধর্মবিশ্বাসের গভীর প্রভাব। তবে ধর্মবোধ অপরিবর্তনীয় কিছু মোটেই নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মীয় ধারণাও পালটে গেছে।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন। তবুও প্রথম জাতের আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে, কারণ, দুই ভিন্ন ধরনের আন্দোলনে ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার উপায়গুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ এতে সহজ হবে।

২.১

এর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত[২] উল্লেখ করব—চম্পারনের নীলচাষী বিদ্রোহ (১৯০৮-০৯)।

এর আগের নীল-বিরোধী আন্দোলনে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দুর্লভ। আন্দোলনের ঐক্যরক্ষার জন্য তখন নেতাদের প্রধান নির্ভর ছিল নানা ধরনের পীড়নমূলক ব্যবস্থা। গোড়ার দিকে আন্দোলন-বিরোধীদের সতর্ক করে দেওয়া হত, যদি তারা নিজেদের আচার-আচরণ না পালটায়, তাহলে পরিণামে অনর্থ ঘটবে। নীলকুঠির সঙ্গে যোগসাজসের অকাট্য প্রমাণ থাকলে শারীরিক নির্যাতন, বাড়িঘর বা অন্যান্য সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বিরল নয়। এ ধরনের প্রত্যক্ষ হিংসার পন্থা নেতারা যথাসম্ভব পরিহার করে চলত। কারণ, এর ফলস্বরূপ পুলিশী-দমননীতি বিদ্রোহীদের সংগঠনকে অনিবার্যভাবে দুর্বল করত। বেশির-ভাগ ক্ষেত্রে আন্দোলনবিরোধিতার জন্য প্রধান শাস্তি ছিল অপরাধীদের একঘরে, সমাজ-চ্যুত করা। এটা বর্ণপ্রথাসম্মত কোনো বিধান নয়। প্রধানত গ্রামের ধোপা-নাপিত তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হত। এ শাস্তির গুরুত্ব শুধু এজন্য নয় যে, ধোপা-নাপিত ছাড়া কারো চলে। এর একটা ধর্মীয় তাৎপর্যও ছিল। যেমন, নাপিতের কাজ শুধু ক্ষৌরকর্ম নয়; পরিবারের নানা শুভ-অনুষ্ঠানে তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু—সবটাতেই এ ভূমিকা শাস্ত্রীয় নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অপরাধীরা তাই এসব মঙ্গলাচার থেকে বঞ্চিত হত। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক পণ্যের সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হত; যেমন, গোয়ালাদের উপর নির্দেশ ছিল—তারা যেন দোষীদের দুধ না দেয়।

এ শাস্তিবিধানের পেছনে যে ধারণা সক্রিয় ছিল তা হল এই যে, কৃষকসম্প্রদায়ের যৌথ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করার অপরাধের জন্য সর্বজনের ধিক্কার দোষীদের প্রাপ্য, এবং এ সামাজিক প্রতিবাদ এবং অনুশাসন তাদের বহুজনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত করবে। যেখানে গ্রামবাসীরা যৌথভাবে, প্রধানত নিষ্কর জমির মাধ্যমে, ধোপা-নাপিতের প্রাপ্য মিটিয়ে দিত, সেখানে এ অনুশাসন সম্ভবত অনেক বেশি কার্যকর হতে পারত।

চম্পারনে ১৯০৮-০৯ সালের আন্দোলনে সংহতি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। এটা অপরিহার্যও ছিল। ১৮৬৭-৬৮ সালের পর চম্পারনে এ ধরনের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আর হয় নি। নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার ঘোষণাও করা হল এই প্রথম। সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন আরো জরুরি হয়ে পড়েছিল, কারণ নীলকরেরাও নানাভাবে প্রশাসনকে কৃষক-বিরোধী ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করছিল। তারা বোঝাতে চাইল—এ আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিক্ষোভের প্রভাব সুস্পষ্ট। এমনও বলা হয়, বাঙলার নেতাদের সঙ্গে চম্পারনের কৃষক-নেতাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে; চম্পারনের আন্দোলন তাই শুধু নীলকরদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধেও; তাই নিজের স্বার্থেই সরকার এ আন্দোলনকে দমিয়ে দিক। বস্তুত, চম্পারনের আগের কোনো আন্দোলনে কৃষকদের রাজবিরোধী মনোভাব এত সুস্পষ্টও কখনো ছিল না। এর প্রধান কারণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নীলকরদের অন্তরঙ্গতা

সম্পর্কে কৃষকদের আর কোনো সংশয় ছিল না। একটা দৃষ্টান্ত থেকে কৃষকদের নূতন মেজাজ বোঝা যায়। আগে বিদ্রোহের শুরুতেই কৃষকেরা বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত প্রশাসনকে জানিয়ে দিত। কারণ, তারা জানত, নীলকরদের পালটা আক্রমণে হিংসা অনিবার্য; আগেভাগে সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার অর্থ, প্রশাসন যাতে সম্ভাব্য হিংসা সম্পর্কে সতর্ক থাকে। এবার কিন্তু বিদ্রোহীরা সরকারকে কিছুই জানাল না। প্রধানত আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে তারা প্রবল শত্রুকে প্রতিরোধ করতে ব্রতী হয়।

নীলচাষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার সংকল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করা হল; কিন্তু এ সংকল্প কার্যকর করার জন্য অপরিহার্য ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। অটুট সংহতি ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রেই নেতারা অনুগামীদের ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

এর আগে নীলকর-বিরোধী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ দূত মারফত গ্রামে-গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হত। এবারও তা করা হল সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে—দশেরা উপলক্ষে (১৯০৮ সালের ২৯শে সেপটেম্বর থেকে ১০ই অকটোবর পর্যন্ত) বেতিয়ায় এক বিশাল মেলায়, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে কৃষকেরা সওদার জন্য এসেছিল।

সরকারি দলিল থেকে জানা যায়, এ প্রকাশ্য ঘোষণার আগেই নেতাদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল। মেলা শুরু হবার তিনদিন আগে দুই প্রধান নেতা, শেখ গুলাব ও শীতল রায়, কয়েকটা গ্রামের মাতব্বর চাষিদের নিয়ে বিখ্যাত চিনি-ব্যবসায়ী ও মহাজন রাধেমলের বাড়িতে শলা-পরামর্শ করে। উদ্দেশ্য, নীলচাষ বন্ধের শপথ সম্পর্কে এখানে আলোচনা হবে। এখানে ঠিক হয়, হিন্দু চাষিরা শপথ নেবে গ্রামবাসীদের কাছে অতি পবিত্র এক পিপল গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তির সামনে। মুসলমান চাষিদের বলা হল, মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা শপথ-বাণী উচ্চারণ করবে। আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ভয়ও দেখানো হল ধর্মের নামে। বলা হল, দোষী হিন্দুদের গণ্য করা হবে গোমাংসভোজী, আর মুসলমানদের শূকরমাংসভোজী হিসেবে। অর্থাৎ এমনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হবে যেন গুরু অপরাধের জন্য তারা ধর্মচ্যুত হয়েছে।

প্রতিরোধের নীতি এবং কৌশল ঠিক করার জন্য যে বৈঠক ডাকা হত, তা বসত রাত্রে, প্রায়শ মধ্যরাত্রে। বৈঠকের স্থান নির্বাচনে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। এ জায়গার নাম দেবী অষ্টান। পাশাপাশি গ্রামের লোক নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এখানে পুজো করত বলে, এ জায়গা অতি পবিত্র বলে গণ্য হত। যে দেবীর সামনে বিদ্রোহীরা ঐক্যরক্ষার শপথ নিত, তা হল কালী। কেন এ দেবীর নির্বাচন, কৃষকদের ভাষ্যে তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। সাধারণত কালীদেবী সংহারের ভয়ালতা ও নির্মমতার প্রতীক। সংকল্পের দুর্জয় দৃঢ়তার দ্যোতক ছিল বলে কি তার সামনে শপথ নেওয়া? মধ্যরাত্রির ঘন-অন্ধকার কি এ শপথের আদর্শ পরিবেশ? সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায়, একটা জায়গা সম্পর্কে কৃষকদের আপত্তি ছিল। তাদের ধারণা, ওখানে ভূতপ্রেতের ভর করেছে। বাধ্য হয়ে নেতারা সময় পালটে দিল—মধ্যরাত্রির বদলে ভরদুপুরে। কারণ, তখন হয়তো ভূতপ্রেতের আনাগোনা থাকবে না।

চম্পারনের পরবর্তী আন্দোলনে (১৯১৭-১৮) এ ধরনের ধর্মীয় প্রভাব বিশেষ একটা দেখা যায় না। একটা সম্ভাব্য কারণ, মহাত্মার ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রভাব। তাদের বিশ্বাস ছিল, গান্ধীর আবির্ভাব সব ধরনের অন্যায় আর শোষণ থেকে তাদের পরিত্রাণের জন্য; পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজশক্তিও তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কাছে পরাভূত হবে। আন্দোলনের সংহতি রক্ষার জন্য ধর্মের নামে শপথের মূল্য তাই অনেকটা কমে গেল।

তিন

কৃষক-আন্দোলনের উপর ধর্মের গভীরতর প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিম্নলিখিত আন্দোলনকে আমরা বেছে নিয়েছি :

(ক) ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলে 'পাগলপন্থী' আন্দোলন (১৮২৪-১৮৩৩)। এক নূতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ('পাগলপন্থী') এবং নানা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কৃষকদের এ আন্দোলনের দুটি প্রধান পর্যায় —গোড়ার দিকে জমিদারি অপশাসনের বিরুদ্ধে এবং ১৮২৪ সালের শেষের দিক থেকে সম্মিলিত জমিদার ও ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। 'পাগল-পন্থা'র প্রবর্তক করিম শাহ। তাঁর মৃত্যুর (১৮১৩) পর তাঁর পুত্র টিপুর আমলেই এ নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠী ক্রমেই কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

(খ) ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলন (১৮৩১-১৮৬০) এখানেও নেতৃত্ব দুই নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠীর। ওহাবি আন্দোলনের শুরু ১৮৩১ সালে। ফরাজি ধর্মমতের প্রধান প্রবক্তা শরিয়াতুল্লার পুত্র দুদু মিঞা ফরাজি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুতে (১৮৬২) ফরাজি আন্দোলনের এক বিশিষ্ট পর্যায়ের অবসান ঘটে বলা চলে।

(গ) সাঁওতাল বিদ্রোহের বিভিন্ন ধারা (১৮৫৫-১৮৮২)।

(ঘ) মুণ্ডা বিদ্রোহের দুই পর্যায় (১৮৯৪-১৯০০)।

(ঙ) ওরাওঁ আন্দোলন (১৯১৪-১৯২০)।

চার

এসব আন্দোলনের উপর ধর্মীয় প্রভাবের রূপ এবং চরিত্র বিশ্লেষণের আগে এ আন্দোলনগুলি সম্পর্কে কয়েকটা ব্যাখ্যার উল্লেখ প্রয়োজন, বিশেষ করে যেখানে কৃষকদের ধর্ম এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। তাদের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং কোনো-কোনো সিদ্ধান্ত আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়। তবে ঘটনা-পরম্পরার উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তগুলির বিচার প্রবন্ধের এ অংশে করা হয় নি, কারণ আন্দোলনগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমরা পরে দেব।

এ ব্যাখ্যাগুলোতে কৃষক-আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব সাধারণভাবে স্বীকৃত। কয়েকটা ব্যতিক্রম সংক্ষেপে নির্দেশ করছি।

৪·১

প্রথম ব্যাখ্যা ভিলেম শেনডেলের[৩] (Willem Schendel)—আমাদের তালিকার প্রথম আন্দোলন, পাগল-পন্থী আন্দোলন সম্পর্কে। তাঁর সিদ্ধান্ত :

(ক) এ আন্দোলন পাগল-পন্থী বলে পরিচিত নূতন এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর নামে অভিহিত হলেও ধর্ম এ আন্দোলনের গৌণ দিক মাত্র। জমিদার- এবং সরকার-বিরোধী এ আন্দোলনের শুরুতে ধর্মের কোনো ভূমিকাই নেই। আন্দোলনের প্রধান কারণ, জমিদারদের সম্পর্কে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান তিক্ততা। আন্দোলন শুরু হবার আগে তিন-চার দশক ধরে জমিদারদের কার্যকলাপে কৃষকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলন তাই অনিবার্য ছিল।

(খ) এটা আসলে 'বহু ধর্মের, বহু জাতির' কৃষক-আন্দোলন। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে আন্দোলনকারীদের অনেকেই পাগল-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল না। নেতৃত্ব পাগল-পন্থীদের হাতে ছিল বলেই সবাইকে নির্বিচারে পাগল বলা হত।

(গ) আসল সংঘর্ষের সময় পাগল সম্প্রদায়ের তিন প্রধান, করিম, টিপু ও তার মা, প্রত্যক্ষ কোনো অংশ নেয় নি। তাদের ভূমিকা ছিল একান্তই 'সিমবলিক' (symbolic)।

(ঘ) এমন-কী, প্রতিরোধের ডাক তারা দেয় নি। বিদ্রোহী কৃষকেরা তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত

করেছে।

(ঙ) শেনডেল এ আন্দোলন সম্পর্কে ফুকসের[৪] সিদ্ধান্তও মানেন নি। ফুক্‌স্ মনে করেন, এ আন্দোলন সর্বতোভাবে 'স্বর্ণযুগ' সম্পর্কিত বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত। শেনডেলের মতে, অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে নূতন আদর্শ জগৎ ও সমাজ গড়ে উঠবে, বিদ্রোহীদের এরকম স্পষ্ট কোনো দর্শন ছিল না। অতিপ্রাকৃত শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে কৃষকেরা বলত বটে, কিন্তু এর উপর তাদের নির্ভরশীলতা ছিল একেবারেই সীমাবদ্ধ।

(চ) তাদের লক্ষ্যও ছিল একান্তই সীমিত—সরকারি বিধিবিধান-নিয়ন্ত্রিত জমিদারি প্রথা। রাজশক্তি সম্পর্কে তাদের আক্রোশের প্রধান কারণ, জমিদারদের বৈধ ক্ষমতার যথেচ্ছ অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে তাদের আবেদন-নিবেদনে কোনো ফল হয় নি।

(ছ) ধর্মের যদি কোনো ভূমিকা থাকে, তা পাগলপন্থীদের সংগঠনের জন্য; আগে থেকেই তা ছিল; বিদ্রোহের সময় তা বিশেষ কাজে এসেছে।

প্রতিরোধের সংগঠনের উপর ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে শেণ্ডেলের শেষ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের যুক্তিতেই টেকে না। তাঁর মতে, এ অঞ্চলের কৃষকেরা বহুধর্ম-বহু-জাতিভুক্ত। অবশ্য এত ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এক হতে পারত, যদি তারা বিশ্বাস করত, তাদের মধ্যে এক 'পরিত্রাতা'র আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁর প্রভাব ধর্ম- ও জাতিগতবিভেদবোধ ভুলিয়ে এক নূতন ঐক্যবোধের সৃষ্টি করতে পেরেছে। আগেই উল্লেখ করেছি, শেণ্ডেল এ আন্দোলনে এ ধরনের পরিত্রাতার ভূমিকা স্বীকার করেন না। তাহলে, নূতন ধর্মমত-প্রচারের জন্য তৈরি সংগঠন আন্দোলনের সংগঠনকে কেমন করে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করল।

৪·২

অন্যভাবেও দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, বিদ্রোহী কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতি অসম্পৃক্ত। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বিহারের ওরাওঁ উপজাতির আন্দোলন সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাকে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যায়। এ ব্যাখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এর প্রবক্তা ওরাওঁদের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রধান বিশেষজ্ঞ শরৎচন্দ্র রায়ের।[৫] তাঁর মতে, ওরাওঁ আন্দোলনের মূল প্রেরণা ধর্মসংস্কার; এর রাজনৈতিক প্রেরণা একেবারেই ক্ষীণ। তাঁর মতে, এ ধরনের ধর্মীয় আন্দোলন ওরাওঁদের ইতিহাসে অভিনব কোনো ঘটনা মোটেই নয়। আগেও তা ঘটেছে। নূতন আন্দোলনে তিনি অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা দেখতে পান। রাজনীতির অস্তিত্ব তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁর মতে তা ওরাওঁ আন্দোলনের নগণ্য দিক। তিনি এমনও বলেছেন, ওরাওঁদের মানসিকতার সঙ্গে এ রাজনীতি সংগতিহীন। বিশেষ করে রাজশক্তি-প্রতিরোধের রাজনীতি।

আমরা পরে দেখব, আসলে ওরাওঁ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্ম আর রাজনীতির অভিন্নতা। রায়ের বিশ্লেষণপদ্ধতি বিচারসাপেক্ষ। ওরাওঁদের এ সময়কার ধর্মীয় চিন্তায় নূতন উপাদানের অস্তিত্ব তিনি লক্ষ করেন নি, বা তাকে যথোচিত মর্যাদা দেন নি।

৪·৩

অন্যান্য ব্যাখ্যায় ধর্মের ভূমিকা স্বীকৃত। কিন্তু সঠিক ভূমিকাটি কী, এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ।

একটি ব্যাখ্যায় ধর্মকে কৃষকদের মধ্যে এক বৈপ্লবিক মানসিকতা সৃষ্টির উৎস হিসেবে শুধু দেখানো হয়েছে। এ মানসিকতার বিশিষ্ট রূপ, বিদ্রোহী কৃষকদের কর্মপ্রয়াসে এক গভীর বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা। এ বিশ্বাস-মতে, দিব্যশক্তি- অনুপ্রাণিত এবং -নির্দেশিত এক পরিত্রাতার নেতৃত্বে কৃষকেরা এক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। সেখানে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব থাকবে না। নূতন সমাজের বনিয়াদ সাম্য এবং সৌভ্রাত্র। শোষণ এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে

সংগ্রামে কৃষকদের জয় অনিবার্য, কারণ তা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। কৃষকেরা তাই শুধু নিজের সীমিত শক্তির উপর নির্ভরশীল থাকবে না; দেবীশক্তির প্রভাবে প্রবল শত্রুকুলের পরাক্রম খর্ব হবে।

এ ব্যাখ্যার প্রধান প্রবক্তা স্টিফেন ফুক্‌স্।[৬] আমাদের আলোচনায় অন্তরভুক্ত সব আন্দোলন সম্পর্কেই তিনি এ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য মনে করেছেন। এ বিশ্বাস কোনো-কোনো কৃষক-আন্দোলনকে কোনো-কোনো সময় নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু ধর্মপ্রভাবিত আন্দোলনের এটাই একটিমাত্র বা প্রধান লক্ষণ নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে আন্দোলনের বিশেষ কোনো মুহূর্তে এ বিশ্বাস সক্রিয় ছিল; কিন্তু পরে তা দুর্বল হয়ে গেছে, বা অন্য ধরনের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাছাড়া, কোন্ বিশেষ অবস্থায় এ ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, তার বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকদের একটা প্রধান দায়িত্ব।

৪·৪

ধর্মপ্রভাবিত কৃষক-আন্দোলনগুলির এক বিশেষ সরকারি ভাষ্যও আছে। এর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, কারণ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে সরকারি নীতি প্রধানত এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে।

এ ভাষ্যের কয়েকটা প্রবণতা লক্ষণীয়। এই মতে, কৃষক বা উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাস 'কুসংস্কার' বই কিছু নয়। কেন এ বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলা যাবে, তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। বিশেষ করে, উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সরকারি মহলে এক অবজ্ঞার ভাবও ছিল। এটা মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। বহুবার সুস্পষ্টভাবে এ ধারণার কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকে উপজাতিরা হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। এমন-কী, উপজাতিদের আন্দোলনে ব্যাপক হিংসার প্রয়োগকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ফল বলেই সরকারি মহলের কেউ-কেউ বলত।

আরও একটা ধারণার উপর সরকারি ভাষ্য গড়ে উঠেছে। তা হল, আন্দোলনের শুরু নেতাদের উদ্যোগেই। সাধারণ কৃষক তাঁদের নির্দেশকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। নেতার উদ্যোগ কিন্তু আদৌ নিঃস্বার্থ নয়। বহুক্ষেত্রে সে 'বিচক্ষণ ধাপ্পাবাজ প্রবঞ্চক' মাত্র।[৭] আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি তার লক্ষ্য। আন্দোলনের খরচ চালানোর অজুহাতে আদায় করা অর্থ প্রধানত সে-ই আত্মসাৎ করত। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কৃষকেরা এ 'চাঁদা' দিত না; তা আসলে জোর করে আদায় করা হত। প্রবঞ্চনার দায়ে নেতার বিরুদ্ধে সরকারের ফৌজদারি মামলা তাই যুক্তিসঙ্গত। নেতা মিথ্যা ছলনায় কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। এর কারণ, তাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির অভাব, বিশ্বাসপ্রবণতা, নেতার, বিশেষ করে ধর্মগুরুর, প্রতি অন্ধ আনুগত্য। কৃষকদের ধর্মচেতনা আসলে অন্ধ মোহ মাত্র।

সরকারি ভাষ্যের একটা প্রধান অর্থ এই যে, ধর্মচেতনা এবং বিশ্বাসের দিক থেকে নেতা আর তার অনুগামীদের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান; কৃষকদের বিশ্বাস নেতার বিশ্বাস থেকে ভিন্ন। নেতার পক্ষে এ ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে প্রধানত নিপুণ প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে। মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত হয়েই সাধারণ কৃষকেরা নেতাকে অনুসরণ করেছে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্রোহোত্তর সরকারি অনুসন্ধানে সংগৃহীত তথ্য বার-বার এ ভাষ্যের অসারতা প্রমাণ করেছে; কিন্তু নূতন বিদ্রোহের সময় সরকার এ পুরনো ধারণা দিয়েই তাকে ব্যাখ্যা করেছে।

বস্তুত, এ পক্ষপাতদোষ আসলে তাদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য অপরিহার্য। না হলে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করলে শাসনব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন অনিবার্য হত, যাতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বই অনিশ্চিত হয়ে পড়ত।

৪·৫

কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্টত সহানুভূতিশীল

কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের বিচারও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

নেতার উদ্যোগ যে সংকীর্ণস্বার্থপ্রণোদিত, এ সরকারি ভাষ্য তাঁরা মানেন না। কিন্তু তার ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতায় তাঁরা সন্দিহান। একটা উদাহরণে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) নেতা সিধু ও কানু ঘোষণা করে, ভিন্‌দেশী দুশমনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের নয়; সাক্ষাৎ ভগবান ('ঠাকুর') তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে এ কথা বলে গেছেন; তাদের সংগ্রামে সব ধরনের সাহায্যর আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। তাই দিব্যশক্তি প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করবে বলে তাদের জয় সুনিশ্চিত। এ ঘোষণার পরেই সাঁওতালদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় কেটে গেল। দুর্বার এক আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা 'হুলে'র জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের ঘটনাটি সিধু ও কানুর একান্তই সাজানো ব্যাপার। এটা তাদের নিছক কৌশলমাত্র। তারা ভেবেছিল, এভাবে বললেই ধর্মভীরু সাঁওতালরা বিশ্বাস করবে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে উদ্যোগী হবে। এক ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত: 'সিধু এবং কানু উভয়েই জানিতেন, পশ্চাৎপদ সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মের ধ্বনিই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।'[৮]

সাঁওতালরা 'পশ্চাৎপদ'—এ ধারণা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়:—নেতাদের ঘোষণায় অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে সাঁওতালদের অনগ্রসরতার সম্পর্ক কোথায়? অনগ্রসর বলেই কি তারা বিশ্বাসপ্রবণ? অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস কি শুধু সাঁওতালদের মধ্যেই দেখা গেছে?

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'র দ্বিতীয় খণ্ডে[৯] রণজিৎ গুহ একটা দিক থেকে এ সিদ্ধান্তের বিচার করেছেন। সে দৃষ্টিকোণ সাঁওতালদের ধর্মচেতনা। এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে 'হুল' বোধগম্য হবে না।

এ বিচার নিঃসন্দেহে মূল্যবান। বিদ্রোহী সাঁওতালদের মানসিকতার গঠন-বিশ্লেষণে তা সাহায্য করবে। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহে ধর্মের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। এটা শুধু বোঝায়, সাঁওতালদের নানা কাজ ও চিন্তাভাবনা ধর্মচেতনা দ্বারা প্রভাবিত।

কিন্তু সিধু-কানুর ঘোষণা কী-ভাবে সাঁওতালদের চরম সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করল, তার বিশ্লেষণ দরকার। ধর্মচেতনা নিরবয়ব, বিমূর্ত কোনো ভাবনা নয়। নানা প্রতীক ('সিমবল'), কল্প (মীথ), সুনির্দিষ্ট সহজগম্য বিশ্বাসকে ঘিরে এ চেতনা রূপলাভ করে, এর বিস্তার ঘটে। সিধু-কানু কি এমন কোনো প্রতীক বা ভাষা ব্যবহার করেছিল, যা সাঁওতালদের বিশিষ্ট প্রতীক- ও কল্পাশ্রয়ী ধর্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? অন্যান্য অনেক অঞ্চলের কৃষকেরাও যথেষ্ট ধর্মবিশ্বাসী ছিল। এ ধরনের ঘোষণা কি সেখানে কৃষকদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারত? তাহলে কোন্ পার্থক্যের ফলে এ ঘোষণা সাঁওতালদের উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছিল? তাই শুধুমাত্র ধর্মচেতনার উল্লেখই যথেষ্ট নয়; বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে বিকশিত এ চেতনার আঞ্চলিক রূপ ও স্বাতন্ত্র্যকেও বুঝতে হবে। যেমন, সিধু-কানুর ঘোষণায় কতগুলি প্রতীক বার-বার ব্যবহৃত হয়েছিল: অনবরত সাতদিন ধরে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরবে; তাতে দুশমনেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিশ্বসৃষ্টির সাঁওতালি কল্পের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হবার কিছু সময় আগে এবং ঠিক পরে গোটা সাঁওতাল-অঞ্চলব্যাপী যে জনশ্রুতি[১০] দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং ফলে বিদ্রোহের মানসিকতাকে বিপুলভাবে প্রসারিত করতে পেরেছিল, তাও সাঁওতালি লোকগাথা এবং কল্পের নানা রূপ।

সিধু-কানুর ঘোষণা তাই নির্দিষ্ট একটা বাণী মাত্র নয়; কীভাবে তা সাঁওতালদের অনুপ্রাণিত করে, তা বুঝতে হবে। নানা অস্থিরতা, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অস্পষ্ট শঙ্কা—এ সবকিছু

তীব্র অনুভবের এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। সাঁওতাল সমাজের কাছে এ সময় বিপুল উদ্দীপনার মতো এল সিধু-কানুর ঘোষণা।

৪·৬

ওহাবি এবং ফরাজি আন্দোলনের ব্যাখ্যায় বিশেষ ধরনের পক্ষপাতদুষ্টতা দেখা যায়।

এক ধরনের পক্ষপাতের কারণ, ঐতিহাসিকদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এ ভেদবোধ যে সক্রিয় হতে পেরেছিল, তার একটা কারণ, এ দুক্ষেত্রেই প্রতিরোধকারীরা ইসলামধর্মাবলম্বী, আর প্রতিপক্ষ প্রধানত হিন্দু জমিদার। বিদ্রোহীদের আপাতপ্রতীয়মান অন্য-ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপকে,— যেমন, মন্দির পোড়ানো, মন্দিরের শুচিতানাশ, গোহত্যা, ব্রাহ্মণনির্যাতন—শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। অন্যদিকে, এ দুই আন্দোলনকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট পর্যায় বলে গণ্য করা হয়েছে।

কৃষক ও জমিদারের সম্প্রদায়গত ভিন্নতা কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকে আবিল করেছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক রাজনৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হবার পর এ পক্ষপাত বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু সমসাময়িক নানা বিবরণেও এটা সুস্পষ্ট।[১১] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বঙ্গদেশে এ দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক জটিল রাজনীতির সঙ্গে ক্রমেই সম্পৃক্ত হতে থাকে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নূতন গোরক্ষা সমিতির কার্যকলাপে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বেড়েই চলল। তার ঢেউ বঙ্গদেশেও এসে পড়ে, যদিও অন্যান্য অঞ্চলের মতো সাম্প্রদায়িক ভেদবোধ এখানে তখনও অত তীব্র হয় নি।

সম্ভবত, ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীর'-এ ভেদবুদ্ধির ছাপ রয়েছে।[১২] লেখক ওহাবি আন্দোলনে উগ্র 'ধর্মোন্মত্ততা'র প্রকাশ দেখেছেন। তাঁর ধারণা মুসলমান সমাজে এ 'উন্মত্ততা' বিশেষভাবে প্রকট। 'উপক্রমণিকা'য় তিনি লিখছেন: 'মুসলমান-বিপ্লবটা সহজে কিছু ভয়াবহ হয়ে উঠে। কেননা, এ বিপ্লব-বিভ্রাটের মূল ধর্মান্ধতার উৎকট উদ্দীপনা···নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের অনেকেই ধর্মের উন্মত্ততায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে'। বিহারীলালের বিচারে, 'তিতুমীর ইহজগতে দস্যু-দানব অপেক্ষা হীন-হেয় বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে'।

এখানে মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনাকে গোটা সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা ও আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। অথচ ওহাবিদের সম্পর্কে মুসলমান সমাজের এক বড়ো অংশের তীব্র বিদ্বেষভাব কারো অজানা থাকার কথা নয়। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের হাতে অপদস্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের প্রায় সবাই ছিল হিন্দু-জমিদারের (বা নীলকরদের) আমলা। হিন্দুদের মন্দির পোড়ানো, গোহত্যা ইত্যাদি কাজকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রকাশ বলে মনে হতে পারে। পরে আমরা দেখব, এর অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব।

তিতুমীর সম্পর্কে নির্মোহ বিচারবোধের অভাব পরবর্তী কালের কোনো-কোনো ইতিহাসকার বা কাহিনীকারদের মধ্যেও দেখা যায়।[১৩] খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণাগ্রন্থে ওহাবিদের অনেক কার্যকলাপকে উগ্র সাম্প্রদায়িকভেদবুদ্ধিপ্রসূত বলে বলা হয়েছে।[১৪]

অন্যদিকে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকেরা[১৫] ওহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের রূপলক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মতে —মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ-বিরোধী নয়; হিন্দুসম্প্রদায়-বিরোধীও; এ দুই আন্দোলন এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশের একটা প্রধান রূপ এবং পর্যায়; হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে ওহাবি-ফরাজিদের আক্রোশ শুধু জমিদার বলে নয়, হিন্দু বলেও।

এ আন্দোলন দুটির অন্য এক ব্যাখ্যায় পক্ষপাত-

দোষ ঘটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। নরহরি কবিরাজের একটি বই[১৬]কে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচ্ছি।

তাঁর মতে, এ আন্দোলন, প্রধানত, অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত শ্রেণীসংঘর্ষ।

শ্রেণীসংঘর্ষের উপাদান এতে অবশ্যই ছিল; এবং অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে তার যোগও সুস্পষ্ট। কিন্তু আন্দোলন ছুটিতে এ যোগের সঠিক ভূমিকা কী, এবং আন্দোলনের উদ্ভব এবং বিস্তারে অন্য কোনো কারণ সক্রিয় ছিল কি না, তা বিচার্য।

লেখক ধর্মের ভূমিকাকে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম বহিরঙ্গ মাত্র[১৭]; রূপটা ('ফর্ম')-ই ধর্মের; আন্দোলনের মূলবস্তু ('কন্‌টেন্‌ট্') সার শ্রেণী-সংঘর্ষ। একটু ভিন্নভাবেও একে বলা হয়েছে: জমিতে অধিকারকে কেন্দ্র করেই এ সংঘর্ষের উদ্ভব, কিন্তু কৃষকদের দাবিদাওয়াকে 'সতর্কভাবে ধর্মের কথায় সাজানো হয়েছে' মাত্র[১৮] অর্থনৈতিক দাবিকে এভাবে উপস্থাপনের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনকে মধ্যযুগের য়ুরোপের কয়েকটা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন য়ুরোপের মতো এখানেও ধর্মের ভাষাই একটিমাত্র সহজবোধ্য ভাষা।[১৯] কারণ, ধর্মীয় প্রভাবের গভীরতা। এটা আকস্মিক কিছু নয়। লেখক তাকে তদানীন্তন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশের ফল হিসেবে গণ্য করেছেন। উপাদান-শক্তি তখনও অপরিণত; সামাজিক বিন্যাস সামন্ত-তান্ত্রিক; তাই 'মানুষ ও সমাজের গড়নে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ'।[২০]

ধর্মের সঙ্গে ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের যোগ তার সংগঠনকে খানিকটা সাহায্য করলেও লেখকের মতে পরিণামে তাকে দুর্বল করেছে। কৃষকশ্রেণীর শত্রুরা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতার সুযোগ পূর্ণ-মাত্রায় নিয়েছে। কৃষকদের শ্রেণী-ঐক্য ও সংহতি তাতে ব্যাহত হয়েছে; আন্দোলনের ব্যর্থতার এটাই প্রধান কারণ। এজন্যই আন্দোলন তার 'আদিম' চরিত্র কাটিয়ে উঠতে পারে নি; 'সচেতনভাবে সংগঠিত' জমিদারিপ্রথা-বিরোধী শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হতে পারে নি; তা মুসলমান সম্প্রদায়ের এক 'ক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া রূপেই থেকে গেছে।[২১]

এ প্রসঙ্গে মূল বিচার্য প্রশ্ন হল এই: নূতন ধর্মীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত কৃষকেরা ধর্ম ও রাজ-নীতির সম্পর্ককে কিভাবে দেখেছিল? তারা কি তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছিল? তাদের কাছে ধর্ম কি ছিল শুধুই 'বহিরঙ্গ'? নাকি ধর্ম তাদের দিয়ে-ছিল এক সমাজদর্শন, এক দৃষ্টিভঙ্গি। যার ফলে তারা তাদের একান্ত পরিচিত জগতের অভিজ্ঞতা, অভ্যস্ত সামাজিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দেখতে পেরেছিল? যে-কোনো প্রতিরোধ-আন্দোলন যদি মূলত ক্ষমতার লড়াই হয়, তাহলে ধর্ম কি তাদের আত্মবিশ্বাস ও সংহতিবোধকে প্রখরতর করেছিল? যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, তাহলে ধর্ম শুধুমাত্র কৃষকদের দাবি উপস্থাপনের ভাষা হবে কেন?

বস্তুত আন্দোলনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখকের কোনো-কোনো মন্তব্য তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। যেমন, ধর্ম কৃষকদের 'একমেঠে' গোছের 'ভাবাদর্শ' জুগিয়েছে।[২২] যদি তাই হয়, তাহলে ধর্ম শুধু কৃষকদের দাবি জানানোর ভাষা নয়। আমরা পরে দেখব, এ 'ভাবাদর্শ' মোটেই 'একমেঠে' ধরনের কিছু নয়; তা ছিল সুবিন্যস্ত, সুসংবদ্ধ; গঠনের দিক থেকে তার মধ্যে কোনো অপরিচ্ছন্নতা ছিল না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, এ ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন উপকরণের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে। যেমন, ধর্মবোধের গোড়া-কার প্রবলতা নানা কারণে ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে, এবং অন্য কোনো প্রবণতা প্রবলতর হতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আন্দোলনের মূল গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে কোনো-সময়ে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা ছিল না।

পাঁচ

আমাদের নির্বাচিত কৃষক-আন্দোলনগুলিতে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটা মাত্র প্রচলিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি। এখানে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্রোহী কৃষকদের ধর্ম ও রাজনীতির পার-স্পরিক সম্পর্কের চরিত্র বিশ্লেষণের কয়েকটা পদ্ধতি নির্দেশ করা। আমরা কিন্তু আন্দোলনের ঘটনা-প্রবাহ উল্লেখ করে তাদের যথার্থতা বিচার করি নি। কারণ আন্দোলনের বিবরণ আমরা পরে দেব। আমরা শুধু এটুকু নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি যে, এ পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে কৃষকদের ধর্ম ও রাজ-নীতির জটিল সম্পর্ক বোঝানো শক্ত।

এ পদ্ধতির একটা সীমাবদ্ধতার উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ আন্দোলনগুলির বিশ্লেষণে বার-বার আমরা এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। ধর্মীয় প্রভাবের আলোচনায় ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ এক ধারণা এ ব্যাখ্যাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মকে মনে করা হয়েছে একটা অনড় কাঠামোর মতো, তা যেন কয়েকটা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আর আচারের সমাহার মাত্র; বহুদিন আগে তা যা ছিল, এখনও তাই আছে। এ কাঠামো যেন দূরে থেকে কৃষকদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে।

এ ধারণা বিচারসাপেক্ষ। নানা কারণে ধর্মবিশ্বাসের রূপ পালটাতে পারে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সময় কৃষকেরা তাদের বিশ্বাস ও আচার থেকে কোনো-কোনো বিশেষ উপাদান বেছে নিতে পারে। এর ফলে অনেক পুরনো বিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জিত, বা রূপান্তরিত হতে পারে। যে ধর্ম কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে প্রভাবিত করে, বহু ক্ষেত্রে তা পুরনো বিশ্বাস থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ। এ প্রভাবের উৎস সাম্প্রতিক কালের নূতন কোনো বোধ, বিশ্বাস বা প্রেরণাও হতে পারে। রাজনীতির সঙ্গে মিলে গিয়ে পুরনো ধর্মের রূপও পালটে যায়। এ পরিবর্তিত ধর্মই কৃষকদের আন্দোলনে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করে।

৫.১

আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলির বিশদ বিবরণ দেবার আগে, এ যুক্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার। এ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরের কোনো-কোনো আন্দোলনের উল্লেখ করব।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কৃষকদের একান্ত গতানুগতিক আটপৌরে জীবনচর্যায় ধর্মের প্রভাব, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের তীব্র অনুভবের মুহূর্তগুলিতে ধর্মের প্রভাব থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। এর একটা প্রধান কারণ, সংগঠিত আন্দোলনে প্রেরণার উৎস ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য তীব্র এক আকুলতা। অন্তত এক বিশেষ ধরনের আন্দোলন সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। এদের অনুপ্রেরণা এ বিশ্বাস যে, আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ও অর্থনীতির রূপান্তর ঘটবে। অবশ্য অনেক কৃষক-আন্দোলনের উদ্দেশ্য অনেক সীমিত। কৃষকেরা সেখানে শুধু চেয়ে-ছিল, তাদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার যাতে খর্ব না হয়।

পরিবর্তনের জন্য এ তীব্র আকাঙ্ক্ষা আন্দোলনের ঠিক আগেই যে শুরু হবে তা নয়। অন্য রূপে অনেক আগে থেকেই তা শুরু হতে পারে। কৃষক-গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট দাবিদাওয়ায় যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে, তা মোটেই নয়।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ইতিহাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিতে পারি: প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুশাসনবিরোধী আন্দোলনের একটা রূপ 'হেরেসি' (heresy)। হিলটন দেখিয়েছেন[২৩], ধর্মীয় প্রশ্নে এ প্রতিবাদের উদ্ভব হলেও সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসমীচীন। পক্ষান্তরে, এ প্রতিবাদকে ধর্মীয় আবরণে কোনো

বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ মনে করাও ভুল হবে। আসলে চার্চের সীমাবদ্ধ চৌহদ্দি পেরিয়ে এ প্রতিবাদ বৃহত্তর কোনো আন্দোলনে পরিণত হতে পারত না, যদি না ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য কারণে এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হত। এ ধরনের প্রতিবাদ মধ্য-যুগের য়ুরোপে বহু বার ঘটেছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা সংগঠিত ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় নি। ষোড়শ শতাব্দীর ফ্রান্সে চার্চ-বিরোধী **Huguenot** চিন্তাভাবনা এরকমভাবেই কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।[২৪]

ঐতিহাসিক এবং সমাজতত্ত্ববিদদের একটা সিদ্ধান্ত এ প্রসঙ্গে আরো গুরুত্বপুর্ণ। তাঁরা দেখিয়েছেন, মধ্য-যুগের য়ুরোপে অনেক সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ছোটো-ছোটো ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা ধর্ম- ও নৈতিক জীবন-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুশাসন সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিল। এ প্রতিবাদী গোষ্ঠীর প্রচলিত নাম সেক্ট্ (sect)। তাঁরা অবশ্য দেখিয়েছেন, গোড়ার দিকের প্রতিবাদী মেজাজ পরে ফিকে হয়ে এসেছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত চার্চের বিধিবিধান মেনে নিয়েছে, বা তার সঙ্গে মিশেও গেছে। অথবা তাদের নিজস্ব বিধান, নিয়মকানুন এমনভাবে গড়ে উঠল যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকল না।

বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে স্বতন্ত্র এ সেক্ট্-গুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা[২৫] চার্চ ও সেক্ট্-এর মধ্যে ছুটি পার্থক্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। চার্চ-ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রচলিত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে মেনে নেয়; এ ব্যবস্থাকে ছুর্বল করতে পারে, সচরাচর এমন কোনো বিধান অনুগামীদের অনুসরণ করতে বলে নি। অন্যদিকে, অন্তত গোড়ার দিকে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে অসাম্যের প্রতিবাদে সেক্ট্ ছিল মুখর। দ্বিতীয়ত, চার্চের শিক্ষা ও প্রচারের প্রধান ঝোঁক, মানুষের পারলৌকিক মুক্তির উপর। সেক্ট্ প্রধানত মানুষের ঐহিক কল্যাণ আর সুখশান্তির কথাই বলেছে।

বস্তুত সেক্টের এ প্রতিবাদী চরিত্র, ও আদি খ্রীষ্টধর্মের মৈত্রী ও প্রেমের বাণী-প্রচার ছুঃস্থ ও শোষিত সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সামাজিক আন্দোলনের উপর চার্চ এবং সেক্টের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা আরো ছুটো বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ধরনের আন্দোলনে চার্চের প্রচার ও বাণীর যে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না, তা মোটেই নয়। তাঁরা বলেন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে বিদ্রোহী কৃষকেরা প্রেরণা পেতে পারে। এমনও হয়েছে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য সুদৃঢ় করার সচেতন চেষ্টা হিসেবে চার্চ কোনো বিধি-বিধান নির্দেশ করল; কিন্তু প্রতিরোধের সময় কৃষকেরা তারই মধ্যে খুঁজে পেল নিজেদের কাজের সমর্থন, প্রতিবাদী চিন্তাধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।[২৬] ফিলিপাইনের কৃষক-আন্দোলনের উপর মূল্যবান এক গ্রন্থে বিদ্রোহী কৃষকের চৈতন্যবিকাশের জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা আছে।[২৭]

দ্বিতীয়ত, সেক্টের প্রচার কৃষকশ্রেণীর সব গোষ্ঠীর কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় ছিল, তাও নয়। মধ্য-যুগের য়ুরোপে অনেক আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা ছিল, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের বাণী। প্রতিবাদী সাধারণ মানুষের কাছে এ বাণীর বিশেষ এক তাৎপর্য ছিল। তারা বিশ্বাস করত, এক পরিত্রাতার আবির্ভাবের ফলে সম্পূর্ণ নূতন এক পৃথিবীর সৃষ্টি হবে, যেখানে কোনো অর্থনৈতিক অসাম্য বা শোষণ থাকবে না। এ ধরনের আন্দোলনের এক প্রধান ইতিহাসকার কোন্ (Cohn) দেখিয়েছেন, যে বৃহত্তর কোনো সংকটকাল ছাড়া, (যেমন চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপব্যাপী প্লেগের বিধ্বংসী বিস্তার), মোটামুটি অবস্থাপন্ন, জোতজমার অধিকারী কৃষকেরা এ প্রচারে বিশেষ সাড়া দেয় নি।[২৮] এর প্রধান আকর্ষণ ছিল তাদের কাছে, যাদের চাষবাস বা অন্য কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত কোন আয় ছিল না—যেমন শহরের শ্রমজীবী শ্রেণী, গ্রামের গরিব চাষি, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত কারিগর বা শ্রমিক, যারা ব্যাবসা-বাণিজ্যের মন্দার ফলে বা অন্য কোনো কারণে সর্বস্বান্ত বা অত্যন্ত ছুঃস্থ হয়ে পড়েছে। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা কেন এ ধরনের আন্দোলনে যোগ দেয়নি তার প্রধান কারণ এর বৈপ্লবিক সমাজদর্শন। তা হল এই যে, জমি বা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ না ঘটলে নূতন আদর্শ সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি সম্ভব নয়; কারণ এ ক্ষেত্রে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে অসাম্য অনিবার্য। ভূমি-স্বত্বাধিকারী কৃষকের কাছে এ সমাজদর্শনের তাই কোনো আকর্ষণ ছিল না।

তাই, বাইরের প্রভাব যাই হোক, বিদ্রোহোন্মুখ কৃষকেরা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তার থেকে অংশমাত্র বেছে নেয়। পূর্ব-ভারতে উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মিশনারি প্রচারের পারলৌকিক তাৎপর্য সম্পর্কে উপজাতিদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ব্যাপটিজমের (baptism) আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পর্কে তারা ছিল সমান নিস্পৃহ। খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণে তাদের উৎসাহের একটা প্রধান কারণ, তাদের এ বিশ্বাস, যে রাজার জাত বলে মিশনারিরা যদি রাজপুরুষদের কাছে তাদের ছুঃখছুর্দশার কথা জানায়, তাহলে হয়তো কিছু প্রতিকার মিলতে পারে। অন্তত গোড়ার দিকে মিশনারিদের আন্তরিকতায় তারা সন্দিহান ছিল না। তাদের আশাভঙ্গ হল পরে। অথচ তাদের এ ধারণা হল, বহিরাগতদের শায়েস্তা করার তাদের পরিকল্পনায় মিশনারিরা সায় দিচ্ছে না। কিন্তু বাইবেল-এর কিছু-কিছু বাণী তখনও তাদের অনুপ্রাণিত করেছে—বিশেষ করে শিষ্যদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের ঘটনা।

তবে বাইরের সূত্র থেকে পাওয়া চিন্তা-ভাবনার নির্বাচিত অংশই শুধু এককভাবে কৃষক-আন্দোলনের ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে পারে না। কৃষকেরা নিজেরাই আজন্ম অনেক প্রাক্তন সংস্কার, বিশ্বাস এবং ধারণায় লালিত। যেখানে সংঘবদ্ধ যৌথ সমাজজীবন টিকে থাকে, সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিত্যকার সহযোগিতা, নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং আরো নানা ভাবে এসব ধারণা কৃষকদের অচেতন স্মৃতিতে প্রোথিত হয়ে যায়। তাই নূতন সেক্ট্-অনুগামীদের জীবনচর্যাতেও প্রাক্তন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে সেক্টের আদিরূপ অপরিবর্তিত থাকে না। আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলিতেও তাই দেখতে পাব।

পুরনো ধ্যান-ধারণা, লোকাচার, রীতিনীতি কতটা বজায় থাকবে, তা প্রধানত নির্ভর করে নূতন সমাজ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে কৃষকদের ধারণার উপর। বিদ্রোহী কৃষককুল যদি বিশ্বাস করে, প্রচলিত জীবনচর্যা এ সৃষ্টির পথে অন্তরায়, তাহলে তাকে তারা নির্মমভাবে বর্জনও করতে পারে।

পূর্ব-ভারতে উপজাতিদের আন্দোলনে এ বিরামহীন অন্বেষণ বিশেষভাবে দেখা গেছে। বারবার পরাজয়ের ফলে তাদের এ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রতিরোধের বিপুল সংগঠন দিয়ে প্রবল শত্রুর পরাভব সম্ভব নয়; সামগ্রিক জীবনচর্যার আমূল রূপান্তর না ঘটলে কখনই তারা শত্রুর সমকক্ষ হতে পারবে না।

[ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

১. কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এমনও বলেছেন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ শুরু করে না। ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনদেশে কিভাবে বিপ্লব শুরু হয় তার আলোচনা প্রসঙ্গে Theda Skocpol (*States and Social Revolutions : A Comparative Analysis of France, Russia and China*, Cambridge University Press, 1979) তাঁর যুক্তির সমর্থনে অন্য এক ঐতিহাসিকের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেন : 'In fact revolutionary movements rarely begin with revolutionary

intention ; this only develops in the course of the struggle itself' (পৃ ১৭) Eric Hobsbawm-এর একটি মন্তব্যও তিনি উল্লেখ করেন : 'The evident importance of the actors in the drama...does not mean that they are also dramatist, producer and stage-designer...Consequently theories which overstress the voluntarist or subjective elements in revolution, are to be treated with caution' (পৃ ১৮).

২. (a) Bengal Political (Police) Proceedings, April 1909. Nos 16-34

(b) India Political Proceedings, Nov, 1912; Nos 135-137

৩. Willem Van Schendel 'Madmen of Mymensingh : Peasant Resistance and the Colonial Process in Eastern India, 1824-1833', *Indian Economic and Social History Review*, April-June, 1985

৪. Stephen Fuchs, *Rebellious Prophets : A Study of Messianic Movements in Indian Religions*. (Asia Publishing House, 1965)

৫. S. C. Roy, *Oraon Religion and Customs* (1928), 1972 Reprint. Edition Indian, Calcutta. Ch. VI. ৬. পাদটীকা সংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য

৭. সরকারি মহলের প্রধান সিদ্ধান্ত ছিল, নেতারা অনুগামীদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়েছিল। সরকারের এ দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। পাগলপন্থী আন্দোলনের নেতা টিপু সম্পর্কে মন্তব্য : 'The superstition of the people enabled him to practise his tricks of necromancy and establish his name as a great Fukeer, which secured him an ascendancy over the minds and actions of his votaries and proselytes which he turned to his own advantage'...(Bengal Judicial Criminal Proceedings, 5 Jan 1826, No 39 ; Report by R. Morrison, Offg. Judge of Circuit, Dacca, 12 Nov. 1825, Para 11]. বারাসাত বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরের আখ্যা : 'Sirdar dacoit'. [Bengal Judicial Criminal Progs ; 6 Dec, 1831 ; No. 49. Letter from the Commissioner of Circuit, 14th Division, 28 Nov, 1831 ; Para 9]. শিষ্যদের উপর তিতুর অনন্যসাধারণ প্রভাবকে বলা হয়েছে 'a striking instance of the influence which a religions teacher can acquire over an utterly rude and uniformed people' [Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April 1832 ; No. 5. Letter from Colvin, Offg. Joint Magistrate at Barasat to the Commissioner of Circuit, 18th Division, 8 March, 1832 ; Para 21]. ফরাজি আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'Doubtless, the object of the leaders was pillage, but their instruments were ignorant ryotts with whom their word was a law' [Bengal Judicial Criminal Progs ; 30 April 1839 ; No. 68 ; Letter from Joint Magistrate. Faridpur, 16 April, 1839 ; Para 8]. ফরাজি নেতা শরিয়াতুল্লার মৃত্যুর পর দলের নূতন নেতা তাঁর পুত্র দুদু মিঞা সম্পর্কে মন্তব্য : 'His son Doodoomeah, now the acknowledged chief... in conjunction with other Mollahs, doubtless with a view of obtaining plunder, but under the plea of religious zeal, exhorted their followers to use every means to make converts to their creed...' [Bengal Judicial Criminal Progs ; 30 April, 1839, No. 69 ; Letter from Joint Magistrate of Faridpur, 17 April 1839 ; Para 3], খেরওয়ার সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান ধর্মগুরু ভগীরথের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনের অভিমত : 'In September 1874, one Bhagrut Manjhee... appeared in the subdivision of Godda, and having gained an ascendancy over the minds of the people by persuading them that they owed the relief afforded them by Government during the scarcity [1873-74] to his influence, proceeded to turn his power to account by promoting a religious movement in the direction

of Hindooism' [Bengal Judicial Proceedings, March 1875, file 40-88 ; Note by the Bhagalpur Commissioner, 9 March 1875 ; Para 3].

৮. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : উনবিংশ শতাব্দী (কলিকাতা, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ), পৃ ৩২১

৯. Ranajit Guha (ed) : *Subaltern Studies*, II, (Oxford University Press, Delhi, 1983) ; 'The Prose of Counter Insurgency' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০. এ সম্পর্কে এ প্রবন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে— Section ৯.১ দ্রষ্টব্য।

১১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (কলিকাতা, ১৩৪২), তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩১১-১২। ফরাজিদের কার্য কলাপের উপর 'দর্পণে' প্রকাশিত চিঠি এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। 'দর্পণে'-র সম্পাদকের কাছে 'শরিয়াতুল্লার [শরীয়াতুল্লার] দলভুক্ত দুষ্ট জবন'দের কার্যকলাপ সম্পর্কে পত্রলেখকের আশঙ্কার কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : 'আমি বোধ করি, শরিয়তুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক'।

১২. বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর, (প্রথম প্রকাশ, ১৩০৪)। স্বপন বসু সম্পাদিত 'পুস্তক বিপণি সংস্করণ' (কলিকাতা, ১৯৮১) আমি ব্যবহার করেছি।

১৩. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী (রানাঘাট, ১৩১৯, দ্বিতীয় সংস্করণ)। মল্লিক তিতুকে 'নদীয়ার রাজনৈতিক জীবনে একটি অশুভকর জ্যোতিষ্ক', 'ধর্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন।

১৪. Abhijit Dutta, *Muslim Society in Transition : Titu Mir's Revolt (1831)*, (Minerva, Calcutta, 1986) দত্ত তিতুর আন্দোলনকে বলেছেন : 'primarily an intolerant puritanical movement to propagate true Islam for which they were ready to unleash the satanic forces of communal violence'. [p. 116]

১৫. এ সম্পর্কে নরহরি কবিরাজ তাঁর *'Wahabi and Farazi Rebels of Bengal* (P. P. H, New Delhi, 1982) বইতে আলোচনা করেছেন ; Ch. 4, পৃ. ১০৩-১০৬

১৬. একই

১৭. 'It was a peasant rising in a religious garb' (পৃ ৫২)। 'In form it was a movement for radical religions reform. In content it was indeed a peasant movement bearing a class character' (পৃ ৫৯)

১৮. 'The Farazi movement was essentially an agrarian movement, though the demands were carefully dressed up in religious catchwords'. (পৃ ৯০)

১৯. 'It was the only language that the peasants would then comprehend' (পৃ ১১০)

২০. 'The movement originated at a time when the social forces were still immature... It was a time when society was on its feudal legs, when religion played an important part in the moulding of man and society' (পৃ ২০)

২১. 'The Farazi actions were not the manifestations of a conscious movement against the Zamindari System. These were spontaneous actions of an infuriated peasantry belonging to a particular sect of the Muslim community' (পৃ ৯৮)

২২. 'rough-hewn ideology'

২৩. R. H. Hilton, 'Peasant Society, Peasant Movements and Feudalism in Medieval Europe", in Henry A. Landsberger (ed) *Rural Protest : Peasant Movemetts and Social Change* (London, 1974). হিল্টনের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃতিযোগ্য : 'No study of heretical movements. which are supported by masses of poor people in towns and country will get far if the heresies concerned are treated as changing currents of thought and feeling about the purposes of religion in isolation from a social context. On the other hand, it is insufficient to treat such heresies as if the beliefs proclaimed were simply a more or less consciously assumed expression of social and political aims thinly

disguised in theological terms'. পৃ ৮৬

২৪. Emmanuel Le Roy Laduric, *The Peasants of Languedoc* (University of Illinois Press, 1976). 'Huguenot concepts which were purely religious in origin and principle became charged in transit—in the process of 'penetrating the masses'—with an active force, an aflective and revolutionary potential'. পৃ ১৭২

২৫. এ বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সূচনা হয় Ernst Troeltsch-এর *The Social Teaching of the Christan Churches* (London, 1931 ; 2 vols)-এর প্রকাশ থেকে। এ বিতর্কের জন্য দ্রষ্টব্য Kenneth Thompson & Jeremy Tunstall (eds) : *Sociological Perspectives* (Penguins,1971) ; Part Four : 'Belief' : পৃ ৩৭৯-৪০৭

২৬. বৃহত্তর অর্থে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'ideology'-র দ্বৈতরূপ, পরস্পরবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে অতি সুন্দর এক আলোচনা করেছেন পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর 'More On Modes of Power and the Peasantry' নিবন্ধে। (Ranajit Guha ed. *Subaltern Studies*, II, O.U.P., 1983). পৃ ৩৩৮-৩৪০. তাঁর মূল একটা সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করছি: '...The same set of ethical norms or religious practices which justify existing relations of domination also contain, in a single dialectical unity, the justification for legitimate revolt. চ্যাটার্জী একে বলেছেন 'this inherent contradictoriness of established ideologies in feudal society' (পৃ ৩৩৮)

২৭. Reynaldo Clemena Ileto, *Pasyon and Revolution : Popular Movements in the Philippines, 1840-1910* (Atenco de Manila University Press, Quezon city, Metro Manila, 1979) এর একটা কারণ হিসেবে Eleto ফিলিপাইন সমাজ রোমান ক্যাথলিক মতবাদকে যে বিশিষ্টভাবে গ্রহণ করেছে তার উল্লেখ করেছেন ; '...like other regions of Southeast Asia which 'domesticated' Hindu, Buddhist, Confucian and Islamic influences, the Philippines, despite the fact that Catholicism was more often than not imposed on it by Spanish missionaries, creatively evolved its own brand of Christanity from which was drawn much of the language of anti-colonialism in the late nineteenth century'. পৃ ১৫ Section : 'The Pasyon and the Masses', বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : পৃ ১৫-২৮

২৮. Norman Cohn, Pursuit of the Millennium (O.U.P., New York, 1976) 'Foreward' to the Third Edition.

১৫ই এলে ফিরে দেখা

নিখিলকুমার নন্দী

ক্যালেনডারের লাল তারিখে ফিরে এলে!

এই তো সেদিন মনে হয় যে বিকলাঙ্গেও তরুণ ছিলে;
সুডৌল না হোক, তনতনে ও গোলগাল ভাব—
আর আজ এ কী! একচল্লিশে বুড়োটে গাল!
ভেঙে গেছে বুকের কাছটা!
শীর্ণজীর্ণ এ-দুর্দশা গ্লানিমা কি নানান অভাব-অনটনে! অদ্যাবধি?

নালিশ? কীসের!
কার বিরুদ্ধে? যুদ্ধ কারও একার?

ঝাণ্ডারুমাল গোলমাল আর কোলাহলে কলহকূট জটপাকানো হোঁচট-খাওয়া
নটীর মতো চপলতায় হাসতে-হাসতে নাচতে-নাচতে
এ কী ভীষণ খরঘাতক নরঘাদক হয়ে এলে!

লোভনীয় ছিলে; হলে প্রলুব্ধ নয়, লোভী!

লাবণ্য তো সুদূর কোন্ রূপকথা দারুচিনিদ্বীপের মধ্যে দেবদারুগাছ
এলাচ ও লবঙ্গলতা!
এখন তেলো মুখেচোখে ঘেমোনুনের চিবুক এবং খড়ি-ওঠা
হাত-পা-চামড়া
কণ্ঠা-জাগা বিরাজমান ঘেয়ো কণ্ঠে লকলকানো জিহ্বা শুধু শানায়:
অপবাদ আর অপঘাতের করাত!
কাকে কাটে কে?

চোখের দ্যুতি যেটুক ছিল মিলিয়ে গেছে চতুরতায় নষ্টামিতে উপক্রুত
দিন ও রাতের বছর-বছর ভ্রষ্টাচারে!

নবলব্ধ সুখের আবাস এবং আসন!
আয়েস ক'রে আবেশচোখে কাটবে সময়, ভাবনা-ভাবে
মাত্র আদেশ দিলেই হবে সমারোহ পায়সান্নে
বৃহৎ-বৃহৎ আয়োজন-সব নিষ্প্রয়োজন—
কাজের কথা অকর্মার ও শ্রমের দাবি বিশ্রামিকের!
তাই তো গড়ার সাজগোজ সব ভাঙার তাজে চাতুর্যে যে
তুবড়িবাজি হাউই হল ম্যাজিক, হলে ছাই ও ভস্মে ফতুর!

এখন তাই ফেরা?

সেদিনকার সে-তরুণপ্রেমিক
ফেরারি ফৌজ গড়তে গিয়ে লড়তে নিয়ে ইতিমধ্যে ফৌত হয়েছে
নড়তে চড়তে সময় লাগবে
এত ব্যর্থ হঠকারী অপচয়ের, খেদ ও গ্লানি এবং বাতে সে আজ কাতর;
যতই ছড়াও গোলাপজল আর ইনটিমেট ও ফুর্ত আতর, ধূর্ত হিসেব!

চুপিচুপির কারসাজিতে মাতাল প্রতিশ্রুতি-শপথ নিকেশ হল
হালালকরা দুলালচাঁদরা ইয়ারবক্সী স্যাঙাত নিয়ে
দিবারাত্রি চ'ষে-ফেলার হিস্যা চাইছে মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া আর
শাদাচামড়া কাবলেপাড়ায় হলফনামা হুঁশিয়ারি ভুলে গেলে!

একটানা সে-দস্যুতা ও মর্ষকামের দাপাদাপি দামালপনা?
তিরিক্ষিচাল তুর্কীনাচন
সেসব ছিল প্রতিভাময় প্রগল্‌ভতা সুদিন-আনার! নবীন অরুণ?

আজ এলে তাই রিক্ত শ্রীহীন
নিঃস্ব এবং নিঃশেষিত
কাঙালপনায় আদেখলে-গা সুখের বায়না শেয়ানা-মুখ!

কিন্তু বঁধু, কোলাকুলি করতে গিয়ে খোলাখুলি বলে নিচ্ছি:
আলিঙ্গন আজ প্রেমের নয় হে, পরিতাপের—
আদরটাদর ভাদ্রমাসের আর্দ্রতাময় আপোস,
মমত্ববোধ! ফিচেল এবং এঁঠেল!

রক্তস্রোতের ক্ষত বেঁধে কি জুড়নো যায়?
ভাঙা কি আর জোড়ে?
বিশেষত অন্তঃক্ষরণ? এতগুলি বেকার মন ও মনুষ্যত্ব
এতগুলি বছর ধ'রে ধুলোয় হল গড়াগড়ি চোরবালিতে ছ্যাঁছোড়!
আজ কি তাই ও-স্নিগ্ধহাসি খাঁড়ার ঘায়ে নুনের ছিটে
নাকি আধা-মড়ার মুখে মনোহারী বিপণনের প্রসাধনী এবং আয়না, মনোরমা!

ক্ষমা? কোথায়? ক্ষমা!

শতাব্দী

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

সময়ের বোবা কান্না শুনতে পাচ্ছি, আতপ্ত অগ্নিশলাকায়
বিদ্ধ সময়ের চোখ, তবু তাকে পথ হেঁটে যেতে হবে—
জানুবদ্ধ বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে; তবুও তাকে
যেতে হবে; বার-বার এই সময়ই সবকিছু
অতিক্রম ক'রে আগামী শতাব্দীর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে;
যুগের সন্ধিক্ষণে আজ সেই কথাই মনে হচ্ছে; জানি না
কে এই কালকে মুক্তি দেবে; তবু এই বিশ্বাসে সমর্পিত
চিন্তায় কাজ করি—কালের আয়ু অপরিমিত এবং
যন্ত্রণার চক্র সেও একটা বৃত্তে পরিসমাপ্ত।

আত্মহননের কারাগারে

খসরু পারভেজ

এসো বন্দী বুরুজ ভেঙে
জীবন-নগরের হাটে
আমাদের যাত্রাপথে প্রতিষ্ঠিত হোক সভ্যতার মানবস্তম্ভ

প্রস্তুতির প্রয়োজন এখন

যুদ্ধের পরেও যুদ্ধ আসে সে যুদ্ধ হৃদয়ের
মানবতার সিঁড়ি বেয়ে কতজন উঠতে পারে হর্ম্যপ্রাসাদে ?

একটি ভবিষ্যৎ দীর্ঘ পথ
কয়েকটি সোনালি চিল
বরফ-নদীর তীর ছুঁয়ে হেঁটে যায়
সুদীর্ঘ সময়ের হাত ধরে

এসো আমরা আমাদের কর্মসূচী তৈরি করে ফেলি
আগামী দিনের সার্বভৌম প্রজন্মের জন্য
আমরা আমাদের অস্তিত্বকে
কতকাল আর সূর্যাস্তের ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে রাখব ?

আমাদের ধানখেতগুলো পাপিষ্ঠ খরায়
প্রতিদিন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে
অসংখ্য কৃষকের মৃত লাশ পড়ে আছে
দুর্ভাগ্যের বুনোঘাসে—নবান্নের বিদিশা বনে
একটি নদীর স্ফীতবুক কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে দেখো
সমুদ্রযাত্রার জন্য আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই
আমরা কতকাল আর আমাদের লজ্জার সঙ্গীত গাইব ?
ভালোবাসার পবিত্র এস্রাজ বড়ো বেসুরো এখন
সুদূর ভিয়েনায় বিটোফেনের ভায়োলিনও থেমে গেছে
লালনের একতারা বাজে না বাউল বাঙলায়
আমাদের হৃদয়ে এখন কষ্ট কান্নার বিভ্রান্ত বিউগল
আত্মহননের কারাগারে আমরা বন্দী এখন

এসো বন্দী বুরুজ ভেঙে
জীবন-নগরের হাটে
আমাদের যাত্রাপথে প্রতিষ্ঠিত হোক মানবতার ভিত্তিপ্রস্তর

বাংলাদেশ

মশারির নীচে

তরুণ মুখোপাধ্যায়

মশারির গা ছুঁয়ে ঝরে শুদ্ধ জ্যোৎস্নার রস ;
কিছু মরা নক্ষত্রের ডানা জোনাকির মতো
প'ড়ে থাকে ঠাণ্ডা মেঝের বুকে ; জ্বলে ;
কিছু কি চেয়েছি আমি আজ রাতে ? পরশ্রীকাতর মেঘে
ঈর্ষার হলুদ বিদ্যুতের মতো জ্বালাময় ; নিজস্ব
উদ্যানে ফোটে চন্দ্রমল্লিকা, ফোটে ঘাসফুল—
আমার দুহাতে কৃতাঞ্জলি ভালোবাসা, জল আর তিল
ভাবি, কাকে দেব ? গ্রহণে সমর্থ কার করপুট ?
আঁশটে গন্ধে ভরা এই পৃথিবীতে প্রকৃত মানুষ নেই
জেনে, পুনরায় ফিরে যাই মশারির নীচে ; বুক ভরে
টেনে নিই হাওয়া, মেখে নিই জ্যোৎস্নার ক্রীম—
ভালো থাকি ॥

নারীর মুক্তি ও বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

উনিশ শতকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং দুঃসাহসিক আর দুঃসাধ্য সংগ্রাম ছিল হিন্দু সমাজে নারীর বন্ধনমোচনের জন্য সংগ্রাম। দুঃসাধ্য বলছি এইজন্যে যে, ধর্মান্ধতা আর দেশাচারের বদ্ধমূল অভ্যাস থেকে সেকালের অশিক্ষিত মানসিকতাকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই ছিল। সংস্কারের প্রতি আনুগত্য মানুষের রক্তে-রক্তে জড়িয়ে থাকে। সংস্কারের সেই কচুরিপানার জাল সরিয়ে নারীর প্রতি নির্দয় অবিচারের অবসান ঘটানো, এবং নারীর অধিকাররক্ষার এই প্রয়াস মানবিকতা এবং যুক্তিবোধের যে ঢেউ এনেছিল, এদেশে সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে তার মূল্য ছিল অপরিসীম। সেদিনের অশিক্ষিত পরিবেশে সমাজের যুক্তিহীন, হৃদয়হীন দেশাচারের বালি সরিয়ে নারীকে তার অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার কাজে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অসামান্য প্রয়াস করেছিলেন, সে যুগে তার তুলনা যেমন দুর্লভ ছিল, এযুগেও সেই দুর্দমনীয় নির্ভীকতা তেমনি অলভ্য।

উনিশ শতকের আরম্ভ থেকেই সমাজের এই যুক্তিহীন প্রথাপালন এবং নির্দয় অবিচারের দিকে শিক্ষিত মানুষের চোখ পড়তে আরম্ভ করেছিল। উইলিয়ম কেরি থেকে রামমোহন রায় এবং আরও পরের যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন নিজের-নিজের পথে চিন্তা করেছেন, কিভাবে নারীকে তার গ্লানি আর দুঃখ থেকে বাঁচানো যায়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা আলাদা। তিনি যে ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসেই শুধু এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তা নয়; ভারতীয় হিন্দু সমাজের নারীমুক্তি-আন্দোলনেও তিনি এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব। নারীর বেদনাকে তিনি শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বীভৎস আর বর্বর প্রথা —সতীদাহ।[১] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক উইলিয়ম কেরিই প্রথম (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রথার

বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা যেমন করেছেন, শাসককুলকে তেমনি সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছেন আইন প্রণয়নের দ্বারা সতীদাহ নিবারণ করতে। রামমোহন রায় তার একযুগ পরে কলকাতায় ফেরেন, এবং 'সতীদাহ' যে শাস্ত্রসিদ্ধ নয়, তা প্রমাণ করেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গভরনর-জেনারেল বেনটিঙ্কের উদ্যোগে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন নয় বছর বয়সের বালক, এক অজ পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়ে।

সতীদাহপ্রথা বিলুপ্ত হলেও সমাজ তখন দেশাচার আর ধর্মীয় সংস্কারের বাঁধনে জর্জর।

> The sati or burning of the widows was stopped by Bentinck··· but nothing had been done to stop polygamy and child marriage...the widows suffered miserably.[২]

শিশু বালিকাকে সাগরে বিসর্জন দেওয়া, শিশু অবস্থাতেই তার বিবাহ দেওয়া, বিধবা বালিকাকে শিশু হলেও ব্রহ্মচর্যের নির্দয় কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া, এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বহুপত্নীক পুরুষের সঙ্গে বালিকাদের বিবাহ দেওয়া—এগুলি ছিল সামাজিক বিধান অনুযায়ী পালনীয় কর্ম। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—

> 'The pathetic tales of woes and sufferings of the kulin girls left the society unmoved.'[৩]

শিক্ষার কোনো সুযোগ বালিকাদের দেওয়া হত না। বাল্যবিবাহে শিক্ষার সুযোগ ছিল না। উপরন্তু বিদ্যাশিক্ষা নারীকে বিধবা করে, এমন একটি সংস্কার সমাজে চালু ছিল।

নারীর সর্বাঙ্গীণ দুরবস্থার একটি কারণ যে তাকে অশিক্ষিত অবস্থায় অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখা, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার সর্বাঙ্গে বাঁধন দেওয়ার ধূর্ত প্রক্রিয়াগুলি স্বার্থপ্রণোদিত পুরুষ-সমাজের দ্বারাই উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। অশিক্ষার পরিবেশে দেশাচার আর কুসংস্কারের বীজ নারীদের হৃদয়েও প্রবেশ করানো হয়েছে। নিরক্ষরতা তাদের উদাসীন করেছে আপন অধিকার সম্বন্ধে। বিবাহের পরেও কুলীন বালিকারা স্বামীর কাছে যেতে পারে নি, এবং বিধবারা নিরাশ্রয় হয়ে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করেছে। আত্মীয়স্বজনের গৃহে তারা হত বিনামাইনের মজুর। অন্যদিকে পুরোহিততন্ত্র-প্রবর্তিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং কৃচ্ছ্রতাসাধনে তাদেরকে ডুবে থাকতে হত।

১৮২৯ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নরত। এই সময়ে ওই কলেজভবনেই ছিল হিন্দু কলেজ; হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিয়োর মানবিক চেতনা এবং যুক্তিবাদী দর্শন প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, যাঁরা নব্যবঙ্গের দল নামে খ্যাত। এই নব্যবঙ্গের দল হিন্দুধর্মকে আঘাত করেছে ঘৃণা দিয়ে, যার ফলে রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে তাদের সংঘাত বেধেছে। অন্যদিকে রামমোহন-অনুগামীরা একেশ্বরবাদী হওয়ায় সমাজ তাঁদেরও বর্জন করেছে। বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ঘটেছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে; ঘনিষ্ঠতা হয়েছে নব্যবঙ্গের দলের সঙ্গেও[৪]; দেশস্থ আত্মীয়স্বজন এবং রক্ষণশীল হিন্দুয়ানির সঙ্গে তাঁর যোগ জন্ম থেকে; সংস্কৃত ভাষা আর হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তিনি অর্জন করেছেন পাণ্ডিত্য। বিভিন্ন দল, উপদল এবং সম্প্রদায়ের ধর্ম- ও সমাজ-ভাবনার সংঘর্ষ ও সংঘর্ষজনিত কোলাহলের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর কর্মজীবনের দিকে। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি কখনও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কখনও সংস্কৃত কলেজে চাকুরিরত। এরই মধ্যে তিনি ভেবেছেন বাঙলা ভাষা ও বাঙলা শিক্ষার উন্নয়নের কথা; প্রস্তুত হয়েছেন আগামী দিনের অগ্নিবহ কর্মজীবনের জন্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরূপে তিনি

তরুণ ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। ইংরাজি ভাষা আর সাহিত্য এবং ইউরোপীয় দর্শন অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেছেন, এবং শিক্ষার ওপরে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌দের রচিত গ্রন্থগুলি ব্যক্তিগত সংগ্রহে আনিয়েছেন।[৫] ইউরোপের ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের বইগুলিও তিনি ইংল্যানড আর ফ্রানস থেকে কিনেছেন। নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিয়েই তিনি নেমেছেন শিক্ষা- ও সমাজ-সংস্কারের কাজে।

ইতিহাসচর্চায় তিনি বুঝেছিলেন যে, অন্ধবিশ্বাসে সমাজের মানুষ ক্রমে-ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন সে যুক্তির কাছ দিয়ে যায় না। সমাজমানসের এই অন্ধতাকে দূর করতে হলে শিক্ষার মশাল জ্বালাতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তাই তিনি ব্যস্ত হয়েছেন।

সমাজসংস্কারের কাজের সঙ্গে শিক্ষাসংস্কার এবং শিক্ষার প্রসারকে যুক্ত করেছেন। রামমোহনের মতো ধর্মসংস্কারের পথে অগ্রসর হন নি; নব্যবঙ্গের দলের মতো ধর্মবিরোধিতার পথেও তিনি এগোন নি। ধর্ম-নিরপেক্ষ হিতবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন তিনি শিক্ষার মাধ্যমে।

দুই

এটাই স্বাভাবিক যে, যিনি ব্যক্তিজীবনে শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, শিক্ষা যাঁর জীবনের ব্রত, তাঁর প্রথম কাজই হবে শিক্ষার সম্প্রসারণ। তখন ছাত্রদের পাঠের উপযুক্ত এবং মুদ্রিত কোনো বাঙলা বই ছিল না, তাই ১৮৪৭ সাল থেকেই বিদ্যাসাগর ছাত্রপাঠ্য বাঙলা বই রচনা আর মুদ্রণের কাজে হাত দিয়েছেন। তবু তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞে অবতরণের ব্রাহ্মমুহূর্তরূপে চিহ্নিত করা যায় ১৮৫০ সালকে। এ বছরেই তাঁর উদ্যোগে সর্বশুভকরী সভা, এবং সভার মুখপত্ররূপে একটি পত্রিকার প্রকাশ, যার উদ্দেশ্য নারীকল্যাণসাধন। ১৮৫০ সালেই ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও বিদ্যাসাগরের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নেটিভ ফিমেল স্কুল (পরবর্তী কালে বেথুন স্কুল) স্থাপিত হয়।

যদিও ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা হয়েছে স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করার, এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনও অনেকে অনুভব করেছেন, কিন্তু বাল্য-বিবাহ এবং অন্তঃপুর-প্রথার জন্য বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয় নি। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে অ্যাডামের রিপোর্টের[৬] সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি—

'নারীশিক্ষার জন্য কোথাও কোনো বিদ্যালয় ছিল না। বস্তুত স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গেই কারও কোনো পরিচয় ছিল না। বরঞ্চ সমাজে এমন একটি সংস্কার চলিত ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়।'

তাই বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও সে বিদ্যালয়ে সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের[৭] বালিকারা আসত না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহায়তায় সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ ব্যক্তিরা। ঢাকা গাড়িতে বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা হল, এবং সেই গাড়ির গায়ে বিদ্যাসাগর মনুসংহিতা থেকে একটি শ্লোকের পংক্তি উদ্ধৃত করে লিখলেন,—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক (অবৈতনিক) ছিলেন তিনি নিজেই। বালিকাদের এই ঘোড়ায়টানা যানটির সঙ্গে তিনি নিজে হেঁটে যেতেন তাদের বাড়ি পর্যন্ত।

১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন; ১৮৫৫ সালে দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক। ১৮৫৪ সালে লনডন বোর্ড অব কনট্রোলের শিক্ষাবিষয়ক যে নির্দেশনামা এসে পৌঁছল (Wood's Despatch) তাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অনুমোদিত হয়েছিল। সেই নির্দেশনামার ভিত্তিতে গভরনর হ্যালিডের মৌখিক অনুমোদন নিয়ে বিদ্যাসাগর সরকারি ব্যবস্থায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। যিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সমাজসংস্কার

ও বিধবাবিবাহের কাজে যিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত, তিনি তাঁর ছুটির দিনগুলিতে হুগলী, মেদিনীপুর আর বর্ধমানের গ্রামে-গ্রামে হেঁটে ঘুরতে লাগলেন স্থানীয় মানুষকে সচেতন আর সক্রিয় করে তুলতে। ১৮৫৭ সালের নভেমবর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি (পরে এই সংখ্যা ৪০-শে গিয়ে দাঁড়ায়) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা সে যুগের পরিবেশে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করার ব্যাপারে তিনি যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তা সকলেই জানেন। স্কুল-পরিদর্শক হেনরি উডরোর একটি রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

Pandit Ishwar Chandra Bidyasagar opened forty female schools, secured an attendance of more than 1300 girls of good caste, and soon found himself liable for between three and four thousands rupees.[৮]

ভারত সরকার রাজি হলেন না এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনে। শিক্ষা-অধিকর্তা ইয়ং এ বিষয়ে যে নোট লিখেছেন, তা হল—

Special aid solicited to a number of female schools got up by Pandit Ishwar Chander Sarma. Aid refused by Supreme Government.

বিদ্যাসাগর চাকরি ছাড়লেন এবং ওই বিদ্যালয়-গুলি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। এই কাজের জন্য একটি অর্থভাণ্ডার খুললেন তিনি। তবে ব্যয়ভারের অধিকাংশটাই তাঁকেই দিতে হয়েছে।

বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হলে নারীসমাজ সচেতন হবে না। শিক্ষাই শুধু পারে নারীকে তার আচার ও সংস্কারের গহ্বর থেকে উদ্ধার করতে। বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষাকে গণমানসে পৌঁছিয়ে দেওয়া তাই তাঁর জীবনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নিজের গ্রাম বীরসিংহতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি একটি বালকদের জন্য এবং আরেকটি বালিকাদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বালিকাদের বিদ্যালয়ে তিনি বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করতেন। এই বিদ্যালয়টিতে বীরসিংহ আর পাশের গ্রামগুলি থেকে ভদ্রঘরের উচ্চবর্ণের বালিকারা আসত অধ্যয়ন করতে। স্কুল-পরিদর্শক হ্যারিসন তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন :

The best aided girls school in my division is at Beersingha, the home of Babu Eshur Chunder Bidyasagar, whose daughter is the most forward girl I have met with in any of the aided schools.[৯]

তিন

আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ ছিল তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনাপর্ব। ওই বছরেই "সর্বশুভকরী" পত্রিকায় নারীমুক্তির সমর্থনে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "বাল্যবিবাহের দোষ" প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধেই নারীর সামাজিক দুর্গতি আর তার উদ্ধারের পথ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত তিনি বালিকাবয়সে বিবাহের কুফল বর্ণনা করেছেন; তারপরেই দেখিয়েছেন যে বালিকাবয়সে বিবাহের ফলেই তাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়; তৃতীয়ত বালিকাবিবাহের ফলে বালিকাবিধবার প্রাচুর্য। তাঁর নিজের ভাষায়—'অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম।' বাল্যবিবাহ রোধ না করতে পারলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারও সম্ভব নয়, এ কথা জোর দিয়ে বলেছেন; সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ করেছেন অশিক্ষিত নারীর দুর্দশার কথা—'যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে—তবে তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে?'

"বাল্যবিবাহের দোষ"—তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধেই জানা যায় যে, নারীর দুর্গতিমোচনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও বাল্যবিবাহরোধের কথা এবং বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত ও সমাজসিদ্ধ করার কথা তিনি একই সঙ্গে ভেবেছেন। পরের আলোচনায় প্রকাশ পাবে, প্রায় একই সময়ে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করা এবং সমাজে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথাও ভেবেছেন। নারীর মুক্তি ও নারীর অধিকার-রক্ষার যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তিনি তাঁর চোখের সামনে রেখেছিলেন, তা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর জীবনী যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের ছিল না।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচনা 'বিধবাবিবাহ' বিষয়ক পুস্তক; ১৮৫৪তে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'; ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ভারতীয় আইনসভার সদস্যদের কাছে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করার জন্য আবেদনপত্র; এবং একই বছরে ২৭ ডিসেম্বরে বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করার প্রস্তাব-সংবলিত আবেদন—নারীমুক্তি আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার মোটামুটি পরিচয় মেলে এইভাবে। এই পরিচয়ের মধ্যে তাঁর করুণার্দ্র হৃদয়ের চেয়ে তাঁর বিজ্ঞাননমস্ক চেতনার রূপই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। আর-একটি জিনিস স্পষ্ট হয়—সেটি তাঁর প্র্যাগম্যাটিক বা বাস্তবসম্মত দৃষ্টি।

যাদের মধ্যে এই দেশাচার এবং প্রথাপালন অবশ্য-পালনীয় হয়ে রয়েছে, তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তির বা মানবিক বোধের কোনো দাম নেই, এ কথা জেনেই বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অগণিত পুঁথি-পুস্তক ঘেঁটে তিনি প্রমাণ করলেন, শাস্ত্রে বিধবার পুনর্বিবাহে কোনো নিষেধ নেই। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে পরাশর-সংহিতায়। পরাশর বলেছেন—

'স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।'

শাস্ত্রের সমর্থনকে তুলে ধরে তারপর তিনি তাঁর অন্তরের ক্ষোভ জানিয়েছেন অন্ধ দেশাচারের অনুসরণ করার জন্য। তাঁর পুস্তকের (দ্বিতীয় খণ্ড) উপসংহারে লিখেছেন—'ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, ছুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস!

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!'

তাঁর এই রচনাংশ থেকে এ কথাই বোঝা যায় যে, শাস্ত্রবচন নয়, বাস্তববিচারেই তাঁর সমধিক আগ্রহ। তাঁর মানবিক দৃষ্টির পরিচয় উদ্ধৃতির শেষাংশে পাওয়া যায়—'অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে,··· হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস-হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন ···যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই,···কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।'

১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বিদ্যাসাগর এক হাজার স্বাক্ষর-সংবলিত আবেদন পেশ করলেন আইনসভার সদস্যদের কাছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকা দুটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেন ইংরাজ রাজকুলের জন্য।

বিদ্যাসাগরের এই উদ্যম যে রক্ষণশীল সমাজের কাছে প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ হয়েছিল, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁকে লাঞ্ছিত করার, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। অপরদিকে বিলক্ষিত সমর্থন জানিয়েছেন দেশের বহু সম্ভ্রান্ত এবং নামী ব্যক্তি। আইনসভার সদস্য মি গ্রানট বললেন,—

If I know certainly that but one little girl would be saved from the horrors of Brahmacharyya by the passing of this act, I will pass

it for her sake.[১০]

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। [Act No. XV of 1856]

কিন্তু শুধু আইন পাশ করেই খুশি নন বিদ্যাসাগর। সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে আইনের অধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। নিজে উদ্যমী হয়ে প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করলেন—৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬। তাঁর সহকর্মী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা বালিকা কালীমতির বিবাহ।

এরপর একটির পর একটি তিনি বিধবা মেয়েদের বিয়ে দিতে লাগলেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে এবং বিবাহের সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করে এই কাজে এগোলেন। সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষিত হওয়া চাই। এর জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত। ১৮৬৬-৬৭তে তিনি ঋণে যখন জর্জর তখন একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যায় যে, তখন পর্যন্ত ষাটটি বিধবা-মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি; তার জন্য তাঁর ব্যয় হয়েছে বিরাশি হাজার টাকা।

১৮৭০ সালে তিনি একমাত্র পুত্র নারায়ণের বিয়ে দিলেন বিধবা বালিকা ভবসুন্দরীর সঙ্গে। এই বিয়েতে তাঁর পরিবারের কারও সমর্থন ছিল না, কেউ যোগ দেয় নি বিয়ের অনুষ্ঠানে। অনুজ শম্ভুচন্দ্রকে এই প্রসঙ্গে যে চিঠি লেখেন তিনি, তা থেকে কয়েকটি পঙক্তি এখানে তুলে দিলাম:

'ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন···বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব-স্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতিসামান্য কথা।'[১১]

চার

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরেই বিদ্যাসাগর আরও একটি আবেদনপত্র পেশ করেছিলেন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করার জন্য সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজাসহ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আবেদনপত্রে বলা হল—

The coolins marry solely for money and with no intention to fulfil any of the duties which marriage involves. The women who are thus nominally married without the hope of ever enjoying the happiness which marriage is calculated to confer particularly on them, either pine away for want of objects on which to place the affections which spontaneously arise in the heart or are betrayed by the violence of their passions and their defective education into immorality.[১২]

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ-আইন পাশ হওয়ায় দেখা দিল বিদ্যাসাগরের বিরাট সাফল্য। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচার করা হল—ইংরাজ সরকার বিধবার বিয়ে দিয়ে হিন্দুর জাতনাশের কাজে হাত দিয়েছে। এই বছরেই শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিরোধ বাধল নতুন ডি পি আই গর্ডন ইয়ং-এর। ১৯৫৮ সালে তাঁর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল সরকারি অসহযোগিতায়। বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করলেন সরকারি চাকরি থেকে। বহুবিবাহ রহিত করার প্রস্তাবও চাপা পড়ল সরকারি দপ্তরে।

বল্লাল সেন-প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথা এবং দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধনপ্রথার দরুন কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। অথচ কন্যার বয়স আট পার হলেই সমাজে নিন্দার রসনা মুখর হয়ে ওঠে।

কাজেই সপত্নী থাকা সত্ত্বেও একই পাত্রে কন্যাকে দেওয়ার চেষ্টা যেমন বেড়েছিল, অনেক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শুধু অর্থোপার্জনের জন্যই বহুবিবাহের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল হিন্দুসমাজে। এই বিশৃঙ্খল ব্যবস্থায় কুলীন কন্যাদের যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, তা অবর্ণনীয়। Dalhousie in ndia গ্রন্থে সমাজের এই বীভৎস অবস্থার বর্ণনা কিছুটা পাওয়া যায় :

Parents murdered their infant daughters either because they could not afford their marriage expenditure or because they foresaw difficulties in marrying their suitably.[১৩]

বিদ্যাসাগর লিখেছেন—'স্বামীগৃহবাস, স্বামীসহবাস, স্বামীদত্ত গ্রাসাচ্ছাদান কুলীন কন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।'

১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যাসাগর গভরনর-জেনারেল বিডনের কাছে আর-একটি আবেদন পাঠালেন। সেই আবেদনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আর যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সতীশচন্দ্র রায়, ভূকৈলাসের সত্যশরণ ঘোষাল প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগরের "বহুবিবাহ" ও ১৮৭২ সালে "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" পুস্তক দুটি প্রকাশিত হল।

বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় এবার অবতীর্ণ হল প্রায় পুরো হিন্দুসমাজ। তাঁর প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন ঘনিষ্ঠ সহযোগী তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তা ছাড়া অগণিত অখ্যাত পণ্ডিত-নামাঙ্কিত মানুষ, যারা ধর্মের নামাবলী গায়ে ঝুলিয়ে মানুষের রক্তমোক্ষণের কাজে রত ছিল, তারা। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় অনামাপ্রবন্ধে লেখা হল—'অনেকে বলেন বঙ্গ বিধবাগণ চিরদুঃখিনী··· কিন্তু বিধবাদের দুঃখ যে অসহ্য এমত আমাদের বোধ হয় না।

'স্ত্রীলোকে যে বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে পুরুষের সদৃশ একথা আমরা স্বীকার করি না।'[১৪]

সেসিল বিডন ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বহুবিবাহ রহিত করার প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা ব্রিটিশ সরকারের স্মৃতিতে তখনও উজ্জ্বল। তাছাড়াও কেউ কেউ মনে করেছেন যে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখেন নি। লনডন থেকে উত্তর এল আবেদনপত্রের—সেক্রেটারি অব স্টেট '…objected to any measure of a legislative character being adopted at present.' কারণ দেখানো হল যে, বঙ্গদেশেও যে যথেষ্ট সংখ্যক বর্ণহিন্দু বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের কাছে এই উত্তর চরম হতাশা নিয়ে এল।

তাঁর বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত-বিষয়ক বই দুটিতে তিনি শাস্ত্রের সমর্থন দেখিয়েছেন যেমন, সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন বহুবিবাহপ্রথার অন্যায় আর অবিচারের দিকগুলি। কুলীনসমাজের বালিকাদের করুণ জীবনযাপনের ছবি তুলে ধরে সকল মানুষের কাছে, তাদের মানবিকতার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

যখন আইনের কাছে তাঁর আবেদন, মানবতার কাছে মানুষের দুর্দশামোচনের আবেদন—সবই ব্যর্থ হয়ে গেল, উপরন্তু সমাজের পণ্ডিতম্মন্য রক্ষণশীল মানুষেরা তাঁর যুক্তি নাকচ করে দিতে লিখিত পত্র বার করতে আরম্ভ করল, তখন বিদ্যাসাগর নতুন পথ ধরলেন। যারা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বহুবিবাহের সপক্ষে তাদের শাস্ত্র ও নীতির জ্ঞান প্রয়োগ করছিল, তাদের বিরুদ্ধে শাণিত ব্যঙ্গের শর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। অসাধারণ শাস্ত্রবিচার ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত হল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের

হুল। বাদানুবাদ বা পলেমিকসে wit and humour-এর এমন সমন্বয় বাঙলা ভাষাতে তো নয়ই, বিশ্বসাহিত্যেও ক্বচিৎ পাওয়া যায়। ড্রাইডেন বা পোপ কিংবা সুইফটের রচনাতেও ব্যঙ্গ এমন তীক্ষ্ণ অথচ রসসমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ হিউমার-এর সঙ্গে রয়েছে মননশীল চেতনা এবং নির্ভুল যুক্তির প্রয়োগ। বলা বাহুল্য এই রচনাগুলি 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য' ছদ্মনামে লেখা।

১৮৭২ সালেই অসহায়া অনাথা নারীদের দুর্গতি লাঘবের জন্য তিনি গড়ে তুললেন 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফানড'—এদেশের প্রথম বীমাপ্রকল্প।

নারীমুক্তির পথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাল্যবিবাহরোধ। এ বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক যুক্তির প্রয়োগ করেছিলেন। সমাজের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল বাল্যবিবাহের কুফল। ১৮৬০ সালে বিবাহে কন্যার ন্যূনতম বয়স করা হয় দশ।

In 1860 the Legislative Council raised the age of consent for married and unmarried girls to ten by an act, largely due to the action of Iswar Chandra Vidyasagar." [Suresh Ch. Ghosh, Dalhousie in India. page 55]

১৮৯১ সালে Age of Consent Bill আইন-সভায় উপস্থাপিত করা হয়। সরকার পক্ষ থেকে তখন বিদ্যাসাগরের অভিমত চাওয়া হয়। তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত তিনি। রোগশয্যা থেকেই পাঠালেন তাঁর অভিমত। তখনও সমাজে রক্ষণশীল মানুষের প্রাধান্য। শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য তখনও মানুষের মনে প্রবল। বিদ্যাসাগরের সেদিনের অভিমত তাঁর জীবনের শেষ লিপি—নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দলিল। দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভে রক্ষিত তাঁর সেই লিপি থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

The protection which the bill proposes to give to child wives is very small. In the majority of cases the first occurence of the menses is from 12 to 15. By fixing the age of consent at 12, it not only leaves unprotected girls above that age, but seems to offer an invitation and encouragement to husbands to consummate marriage as soon as the wives are 12. I cannot approve of a measure which tends to license the torturing of wives after they have attained the age of 12.

Though on these grounds I cannot support the bill, as it is, I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child wives without in any way conflicting with any religious usage. I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses.

বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট অভিমত—স্ত্রী ঋতুমতী হওয়ার আগে স্ত্রীসঙ্গম স্বামীর পক্ষে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।

পাঁচ

নারীর বন্ধনমোচনের এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটানোর জন্য বিদ্যাসাগরের এই জীবনব্যাপী সংগ্রাম সেদিন দেশের অন্যান্য অংশকেও যে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা জানার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। মহারাষ্ট্রে ফুলে এবং বিষ্ণু পরশুরাম পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের কর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিষ্ণু পরশুরাম নিজেও একটি বিধবা বালিকাকে বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তক দুটি তিনি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁকে সেখানকার মানুষ 'মহারাষ্ট্রের বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত করেছিল।

অদ্রের বীরেশলিঙ্গম সমাজসেবা ও নারীমুক্তির কাজে বিদ্যাসাগরের প্রেরণার কথা যেমন স্বীকার করেছেন, উড়িষ্যার ফকিরমোহন সেনাপতিও তেমনি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর ঋণ। বিহারে সরকারি আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে 'বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল ডেভলাপমেনট।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯১, জুলাই ২৯) প্রায় একশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। পরাধীনতা-উত্তর ভারতে যে নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তাতে নারীর অধিকার প্রায় সবক্ষেত্রেই সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের ১৪, ১৫ ও ১৬ ধারাতে বলা হয়েছে যে, দেশের প্রত্যেকটি মানুষ জাতিধর্ম- এবং স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে **সমান অধিকার** ভোগ করবে। নারীর অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য যে আইনগুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি হল—

বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪), হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬), সমবেতনমূলক আইন (১৯৭৬) প্রভৃতি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারীর অনুকূলে আইনের রক্ষা-কবচ ভারতবর্ষে এখন অন্য কোনো দেশের চেয়ে কম নয়।

তবুও ভারতের সমাজমানস এখনও সেই উনিশ শতকেই পেছিয়ে আছে। তার একটি কারণ, সাধারণ মানুষ এখনও অশিক্ষিত। ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার সংখ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলির অনুরূপ। অশিক্ষিত মনে সংস্কার বাসা বাঁধে, আলোবাতাসহীন অন্ধকারে চামচিকের মতো তার ঘোরাফেরা। সম্প্রতি রাজস্থানে রূপ কানোয়ার নামের এক অষ্টাদশী তরুণীকে 'সতী' করার ঘটনা এবং পুরীর শঙ্করাচার্যের মতো ধর্মান্ধ মানুষের নির্বোধ উক্তি হিন্দুসমাজের সেই আদিম আচারনিষ্ঠা ও সংস্কারাচ্ছন্নতাকেই প্রকট করে তুলেছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে এখনও বধূ-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিধবাবিবাহ সমাজে একখনও বিরল ঘটনা। মনে পড়ছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের একটি উক্তি[১৫]—

For otherwise is the case with the question of the re-marriage of Hindu widows. I am afraid, public opinion has not advanced to the stage that is necessary or desirable. *A future Vidyasagar is needed* to sound the death knell of a usage that has darkened many a hindu home and has blasted the life of many a hindu widow.

পাদটীকা :

১. উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 'সতীদাহ' যে কী কুৎসিত বর্বরতায় পরিণত হয়েছিল, তার পরিচয় গোবাচাঁদ মিত্রের "সতীদাহ" গ্রন্থে।

২. Suresh Chandra Ghose—Dalhousie in India, p 35

৩. Dr. R. C. Majumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, p 15

৪. Young Bengal Group-এর 'Society for the Acquisition of General Knowledge'-এর সভ্য হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে থাকতেই।

৫. Santosh Kumar Adhikari—Vidyasagar and the Regeneration of India, p 29

৬. Dr. R. C. Majumdar—Ibid, p 13

৭. মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত স্যর সৈয়দ আহমদও নারীশিক্ষা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।—আলী আনোয়ার

৮. সন্তোষকুমার অধিকারী—বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি, পৃ ১২৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭

১০. Subol Chandra Mitra—Isvar Chandra Vidyasagar, p 297

১১. সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত—বিদ্যাসাগর, নির্বাচিত পত্রাবলী, পৃ ৯১

১২. Subol Chandra Mitra—Ibid, p 555

১৩. Suresh Chandra Ghose—Ibid p 36

১৪. সন্তোষকুমার অধিকারী—বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি, পৃ ৭৪

১৫. Surendra Nath Banerjee—A Nation in Making, p 93

বৃত্তরেখা

রফিউদ্দিন

এরকম ঠিক হবার কথা ছিল না। তবু অদ্ভুতরকম একটা কিছু হয়ে গেল। নীল সন্ধেয় বেজায় একটা ওলোট-পালোটের মতন। যা হয়তো ঠিক-ঠিক চাওয়া নয় আমার। অথচ তার সাথে দেখা হবার প্রত্যাশা পুষছি কিছুদিন ধরেই। এইদিকে এই পথে যখনই যাওয়া-আসা, হঠাৎই তাকে দেখার সাধ হয়। কথা কইবার সাধ হয়। দু-দণ্ড থমকে দাঁড়াতে সাধ হয়। আজও ভাবছিলুম। সিঁদুর-টিপ সূর্যখানা মুছে যাবার পর একটু আগেও ভাবছিলুম। ফিরব বলে এপারে এসে দাঁড়াবার সময়েও ভাবছিলুম। তথাপি যখন ফলবতী হল ভাবনা, নেহাত দৈবাৎ ঘটনার মতন, আমি বিস্ময়করভাবে মিইয়ে যেতে থাকলুম। একটু আগের যমুনার ঢেউগুলো আমার বুক থেকে মিলিয়ে যায় নি এখনো। সাঁকোর খুঁটিতে বাধা স্রোতের কলকল শব্দ কানে এসে বাজছে। ওপারের শ্যামলা-সুন্দর যে গ্রামখানা ফিকে হতে-হতে এক সময় কালোয়-কালোয় লেপটে গিয়ে ভুতুড়ে হল, চোখের থেকে তাও এখনো ছাড়ায় নি। ঠিক তখনই, জীবনে এই প্রথমবার হঠাৎ কোটিপতি হবার মতন প্রচণ্ড আনন্দে বা দুঃখে বা থিতু ভাবনায় বোকা হয়ে উঠবার স্বভাবে আমি বাক্‌স্তব্ধ হয়ে গেলুম। মুখে একটিও কথা সরছে না। সে আমার মুখোমুখি। পুরোনো সাইকেলটার ঠেসমুক্ত হয়ে সটান দাঁড়িয়ে সদ্য অন্ধকারকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম আমি।

পারু এই তৃতীয়বার প্রশ্ন করল, কেমন আছ বলছ না কেন? আমাকে খুব কি অচেনা মনে হচ্ছে তোমার? আমি তবু নির্বিকার নিরুত্তর হয়ে আছি। "চরণবাবু" জুতোর দোকানের মালিক আমি। বিকেলের রঙ দেখতে এসেছিলুম। লাভ-লোকসানের হিসেব থেকে ছিটকে বেরিয়ে অবিশ্বাস্য হলেও এক-একদিন আসি। দোকান বন্ধের দিন। চওড়া চরের ওপর আলাবাঁধা সরু পথ পেরিয়ে জলের পাশে থামে। পুব-পশ্চিমে গড়িয়ে যায় যমুনা। মরা-হাজা। শুনেছি এককালে

রমরমা সময় ছিল। কামোট কুমিরের গতিবিধি ছিল। আজ নেই। আজ শুধু প্রশস্ত চরাভূমির ওপর সে বেঁচে আছে ভালোবাসার ক্ষতের মতন। স্মৃতিচিহ্নের মতন। ফিঙে মাছরাঙা জল ছুঁয়ে ছোঁ মারে সারা-দিন। ভাঁটা নামলে বালকের দল জল ঘোলায়। আকাশ-আলোয় তাল মিলিয়ে জলের রঙ বদলায়। জেলে-নৌকো ভাসে। তারই ওপর আড়াআড়ি বাঁশের সাঁকো। বাঁশের পাটাতন। বাঁশের রেলিঙ। বন্যার বছর এলে খড়কুটোর মতন ভেসে যায়।

পারুর প্রশ্ন আমাকে মোটেই ভাবাচ্ছে না। কৌতূহল জমছে না। দেশলাই ঠুকে বিড়ি ধরালুম আমি। আচমকা আলোয় পারুর চোখ, পারুর মুখ দেখে নিলুম। দু বছর পর। তারপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বিড়ি টানতে থাকলুম। একখণ্ড ধোঁয়াও আমার চোখে পড়ছে না। পারু বলল, ফিরে গিয়ে বাড়িতেই থাক তো এখন? এদিকে কি আসই না? আমি কথা বলছি নে। পারু বলছে, মাঝখানের অনেকটা দিন ভেঙে ছিল সাঁকোটা। তখন এলে দেখতে, হালছাড়া নৌকোয় পারাপার করছে মাঝি। এপার ওপার। খালি হাতের দারুণ তার কৌশল! টাল খাচ্ছে, ডুবছে না।

—সনাতনকাকার নৌকোটা? হঠাৎই বলে ফেললুম আমি। বলেই যেন চমকে উঠলুম।

—চেন বুড়োকে? চালায় কিন্তু বেশ। দাঁড় নেয় না। যেন ছপছপ শব্দ উঠল কোথাও। আমাদের গ্রামের তিরতিরে পদ্মাখালে শরীর উপছে যৌবন। বানের বছর। থই-থই জল। বিলে-জলায় তালের ডোঙা। কলার ভেলা। দীনু মল্লিক মেছো নৌকায় খ্যাপলা নিয়ে ভাসল। একদিন বললুম, শেখাও না দীনুদা। তুমি খ্যাপলা মার, আমি বৈঠে ধরে দেখি যদি পারি।

পেরেছিলুম। তারপর মাঝে-মধ্যেই বৈঠে ধরেছি। এই যমুনায় সনাতনকাকার নৌকোতেও একদিন ধরেছি। মনে আছে। অনিতেশ ছিল সাথে। সনাতন-কাকা ভরসা না পেয়ে একটু ছেড়েই ফেরত নিয়ে-ছিল বৈঠে। গুনগুন করেছিল অনিতেশ। সুর তালের ধার না ধরে আমিও গেয়েছিলুম, দু-কলি। তোমারে পাইবার আশে আমি হইলাম নদী।

সাঁকোর শুরু মুখে দাঁড়িয়ে আমরা। চারদিকে থমথমে গ্রীষ্মকালীন ক্লান্তি। পাড়ঘেঁষা গয়েশপুরের ঘরে-ঘরে বাতি জ্বলছে। দু বছর আগেও এখানে বিজলি আসে নি। গোটাকয়েক বাড়িতে এখন চোখে পড়ছে তার দ্যুতি। ভরা জোয়ারে তার নাচানাচি। আমাদের চারপাশে জনমনিষ্যি নেই। দু-একজন হঠাৎ এসে কৌতূহলী চোখ ফেলে চলে যাচ্ছে। তাদের অনেককে আমি চিনি। গয়েশপুরে থাকে। পুরু-গোঁফআলা রোগা-লম্বা তো খুব চেনা। চাষবাস আছে। ফাঁকে মুরগির ব্যাবসা করে। পোলট্রি-মালিক। গ্রামের ফাংশনে সেবার তিনটে হিন্দি ছবির গান করেছিল। অনিতেশের সাথে আমিও সে ফাংশনে ছিলুম। যতদূর মনে পড়ছে, ওর নাম মহাদেব। আমাদের খুব কাছে এসে সম্ভাব্য মহাদেব আমাকে চিনতে পেরেছে মনে হল। তারপর, তারও চলে যাবার পর আমি নিজের ভেতর থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসে পারুকে বলে ফেললুম, তোমার দেখছি সাহস হয়েছে খুব। আগে উলটোটা ছিলে। একেবারে ভয়বতী। বদলালে কী করে?

পারু হাসল। আগের মতন একইরকম হাসে কিনা পারু তা দেখতে পাচ্ছি নে। শব্দের সঙ্গতি খুঁজলুম। একই সুরছাঁদ ধরা পড়ল কানে। এ হাসি অনেকক্ষণ চলুক, মনে-মনে আমার এই চাওয়ার মুখে ছাই দিয়ে সে থামল। বলল, দু বছরে বয়সের চেয়ে মনটা বেড়েছে বেশি। তুমি যাবার পর একটু-একটু সবটা একদিন জানল সবাই। তারপর সামনে-পেছনে এত কথা শুনেছি, ভয়ের এখন আর কিছু নেই। ভয় এখন তোমার জন্যে। পাছে তুমিও সেইসব শোন। পাছে কেউ এসে বলে, মুসলমানের হাত ধরে পালিয়ে যাচ্ছে পারু। যাক। হরেন মিত্তিরকে আমরা

ছাড়ছি নে।

আকাশের গায়ে চেয়ে রইলুম আমি। আমার মনে পড়ে গেল, এখন রমজান—চাঁদের কৃষ্ণপক্ষ। আমি ইউনুছ আমেদ, আমার এখন মাসব্যাপী দিনভর রোজা করার কথা। একটু আগে মুয়াজ্জিন নিশ্চয়ই আজান হেঁকেছে মসজিদে। ইফতারের সময় উতরে গেছে। এখন মগরের নামাজের জামাত। মসজিদে উছলে পড়বে ইমানদারের ভিড়। কতদিন আমি সেই কাতারে নিবিষ্ট মনে দাঁড়াই নি। মোনাজাত করা হয় নি, রব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও অফিল আখেরাতে হাছানাতাও অকিনা আজা-বান্নার···। মাত্র আর কয়েকটা দিন পরে এই রম-জানের শেষ। সেই সন্ধেয় পশ্চিমমুখী হয়ে তন্নতন্ন করে আকাশে কাস্তেফলা চাঁদ খোঁজবার দিন। সেইরাতে আর সেহেরী নেই। তারাবীহের নামাজ নেই। যেন একটানা একমাসের স্বেচ্ছাবন্দীত্ব থেকে সদ্যোমুক্তি। কাল সারাদিন খুশির খোশবু। ঈদের হাওয়া। এখনই প্রথম আমি সচেতনভাবে দেখতে পেলুম, পারু মিত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি চব্বিশের ইউনুছ আমেদ। অবিকল অনিশ্চল ইউনুছ আমেদ। বিস্তর দূরত্ব মধ্যিখানে।

পারুকে বলতে চাইলুম, হাত ধরেই এসো তবে। মুসলমানের ঘরে এসেই ওঠো। বললুম, আছ কেমন?

পারু বলল, কী জানি। মন্দ নেই মনে হয়।

বললুম, শেষ চিঠি কি পেয়েছিলে?

বলল, হ্যাঁ। যত্নে আছে সবগুলো। আজকাল ওদের পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছে হয়। ভাবি, তোমাকে মনে রাখবার মনটা রেখে আর কাজ নেই। বাবার আয়ে বাঁচছি বলে তার মতন চলাই নিয়ম। তা ভাঙবার সাধ্যি কি আমার?

—বেশ বুঝেছ। কিন্তু কত অনিয়মই অহরহ নিয়ম হয়ে যাচ্ছে। সে কথা থাক। কিছু বলতে চাইলে বলো।

—কিচ্ছু নেই। শুধু বলো, একটুও না জানিয়ে —চুপিচুপি চলে গিয়েছিলে কেন? সামাজিক হবে বলে? ভেবেছিলে, এদিকটা পারু বুঝবে না?

মুহূর্তে আমার ভেতর বহু কথা কিলবিল করে উঠল। আমাদের পায়ের নিচেয় সাঁকো। তার নিচেয় পুরন্ত যমুনা। অন্ধকারে জলছায়া অদৃশ্যমান। ঝোপ-ঝাড়ে নিঃশব্দ জোনাকির উড়ো আলো। জলের ওপর উড়ছে এসে অনেকেই। ঢেউয়ে কাঁপছে প্রতিবিম্ব। ভেঙে যাচ্ছে। আবার নতুন আলো। আবার ভাঙছে। এসময় অনিতেশ হয়তো রেকর্ড বাজিয়ে গান শুনছে। এরকমই স্বভাব ছিল ওর। অগোছালো গলায় সুর মেলাত গানে। একদিন সে ডেকে আনল আমাকে। এইখানে। পাড়ে বসে সামনাসামনি বলল, কিছু মন্দ ভেবে নিস নে ইউনুছ। তোর আর পারুর মধ্যেকার সম্পর্ক আমি বুঝি। আমি তো পারুর দাদা। কিন্তু ওসবের কী দাম আছে বল? সমাজ বলে তো ব্যাপার একটা আছেই। কেউ কি দাম দেবে? পারলে এখনো তুই সরে দাঁড়া, ইউনুছ। পারুকে বুঝতে না দিয়েই তোকে সরে যেতে হবে।

সেদিনও বহু কথা বলতে চেয়েছিলুম অনিতেশকে। কলকাতা-ক্লাসে পড়ি। তিন মাইল পায়ে হেঁটে, পাঁচ মাইল বাসে চড়ে আড়াই ঘণ্টার ট্রেনপথ প্রতি-দিন। অজ গ্রাম ছেড়ে তাই স্টেশনের দেশে এসে আছি। যাবতীয় অনিতেশ জানে। এহেন অনিতেশের সনির্বন্ধ গুরুবচনে সেদিনও কিলবিলিয়ে উঠল কথারা। তুই কি বইমেলায় জুতোর শুকতালা ক্ষয় করিস নে অনিতেশ? সংস্কৃতির উৎসবে খ্যাপার মতন হাততালি দিতে তোকে কি আমি দেখি নি? সংহতির সেমিনারে হাঁ করে কি কথা গিলিস নে তুই? সেবার ঈদুজ্জোহায় এই ইউনুছ আমেদকে কোলাকুলি করে তুই কি 'ঈদ মুবারক' বলিস নি? এসব একটি কথাও বলা হয় নি। ওপারের ন্যাড়া বাঁশবাগানে দাউ-দাউ শিমুল। পাতাবিহীন। টুপটাপ খসে পড়ছে একেকটা

আগুনরঙ ফুল। সে দৃশ্যে দৃষ্টি বন্ধ রেখে শান্ত স্বরে বলেছিলুম, তুই বলছিস এই কথা?

—ইউন্থছ, তুই মুসলমান। আমাদেরও তো একটা সমাজ আছে। ভেবে ছাখ!

আমি ভাবি নি। আমি একটুও না ভেবে পা বাড়িয়ে বলেছিলুম, কিচ্ছু পারু জানবে না, এই তো? বেশ।

আমার বাস্তব জ্ঞানের প্রশংসা করেছিল অনিতেশ। শুধু জানে নি, এই মানুষের সমাজকে কতখানি অবিশ্বাস করে সেই মুহূর্তে আমি সমাজের মানুষ হয়ে গিয়েছি।

উত্তরের প্রত্যাশায় শব্দহীনা পারু। সাঁকো পেরোতে আসছে কেউ হ্যারিকেন হাতে। ফুরিয়ে-আসা হাতের বিড়িটা ফেলে দিলুম। জলের ওপর ছ্যাত করে শব্দ উঠে বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেল আমার। আমি সেই হঠাৎ-শব্দে নিচু হয়ে দেখলুম, জোয়ারের টান কমে এসেছে। হাওয়া বইছে জোরে। ওপারের পাড়া থেকে 'সাধু' নামের কাউকে কেউ হাঁক পেড়ে ডাকছে। সাঁঝ-যমুনায় 'সাধু' বাজছে গম্ভীরে। আমি সেই শব্দের ভেতর নিঃসীম শব্দহীনতায় হারিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ।

হ্যারিকেন হাতে মানুষটা চলে গেলেন। মাঝ-বয়সী। আমার অচেনা। নজরদারিতে মনে হল, এখানে এ সময় এভাবে দুজনকে তাঁর বেজায় অপছন্দ হয়েছে। পারুর আবছা চোখে তাকালুম। চোখাচোখি হল। পারু বলল, কুনজর দেখেছ? এসো, বাড়িতে গিয়ে বসি। বললুম, ঘরের চোখ কি অন্যরকম হবে? তার চেয়ে থাক বরং। ফিরে যাই। হিসেব কষে কাজ নেই আর।

আচমকা আমাকে এক গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে ভাবি নি। আমি 'চরণবাবু'র মালিক। সাইনবোর্ডের 'আশা স্যু হাউস' বদলে ফেলে কদিন আগে 'চরণবাবু' করে নেবার পর অনেকেই আমাকে এখন চরণবাবু বলে ডাকে। মদনাতলার বাজারে যে তিনটে জুতোর দোকান, আমারই এখন খদ্দের বেশি। তারা আমায় সমীহ করে, আপনজনের মতন কেনা-কাটা সেরে বিড়ি চেয়ে খায়। মেয়ের বিয়ে, বউয়ের ঝগড়া বাজমির মামলার মতন ভারী-ভারী সমস্যাতেও যুক্তিপরামর্শ করে। আমার ভালো লাগে। অথচ একদিন নিজের সাথে কী ভীষণ লড়াই করেছি। কম বেগ পেতে হয় নি এখানে মন বসাতে। চামড়ার গা-ঘিনঘিন নতুন গন্ধ। দরকষাকষি। গ্যারানটির হ্যাপা। এক-একটা দারুণ মিথ্যেকে দারুণ সত্যি করে দেখাবার কসরত। অথচ চাকরির বাজারে গাছের চেয়ে ভূত বহুগুণ বেশি। এখন দিব্যি আছি এইখানে। আমার চোখ ইদানীং যে-কোনো মানুষের মুখের আগে পায়ের থেকেই ঘুরে আসছে। একনজরেই বলতে পারছি কার পায়ের কত মাপ। কোন্ চামড়া কী রঙ হলে কোন্ পায়ে মানাবে। নন্দ বণিকের মতন ঝানু দোকানদারও এখন বলতে শুরু করেছে, আমি বড়ো কারবারি হতে পারব। আমার বরাতে নাকি ব্যাবসা টিকে যাবে। কোনো গ্যারানটি কার্ড দরকার হবে না তাতে।

পারু আমার সেইখানে খোঁচা দিল। তীব্রবেগে খোঁচা দিয়ে বলল, বেহিসেবি তুমি? কেমন চলছে জুতোর ব্যাবসা তোমার? কত টাকা আয় করেছ বছরে?

সবই পারু জানে! আমি তৎপর হতে পারলুম না। ব্যাবসার গোপনীয়তা বলে যে একটা ব্যাপার আছে, ও এখন সেইখানে হাত দিতে চায়। 'মডার্ন শু'-এর শচীসুন্দর আমার এত যে ভাবের লোক, তার সাথেও কেনাবেচার সঠিক কথা হয় না কোনোদিন। আমাকে 'সাহা' বলে ডাকে শচীদা। বড়ো গঞ্জে দোকান ওর। যখনই গিয়ে বসি, মালপত্তর বেশি দেখে মন খারাপ হয় আমার। একেকটা নতুন ডিজাইন দেখি, সুকতলা, সোল কিংবা চামড়া পরখ করি। দামদস্তুরের খবরাখবর শুনি। অপেক্ষাকৃত

ভালো জুতো দেখেও বলি, ফোম ঢুকিয়েছ? রাবার ফাইবার নাকি? ছুনঘরি লাইনিঙ। সোলের ছাপটা ভেজাল নয়ত? শচীদা হাসে। বাজি ধরে। পুজো-মরশুম পার হলে যখনই দেখা হয়, একসঙ্গে চা খাই। বেচাবিক্রির কথা উঠলে যথাসম্ভব কম করে বলি। দুজনেই। এবং দুজনেই খুব ভেঙে-পড়া মানুষের মতন হাত কামড়াই। একেকদিন শচীদা আমাকে জিজ্ঞেস করে, কবিতা-টবিতা কি লেখ এখনও? সাহিত্যসভা? আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। হেসে বলি, ও দিয়ে কি পেট চলে শচীদা? ব্যাবসার কথা বলো।

পারুর প্রশ্ন আমার সেই নিজস্ব গোপনীয়তায় ঘা মারল। আমি থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে বললুম, এটা আমার স্বাধীনতা, পারু। স্বাধীন হবার উপায়। তুমি তা চাও নি? চাও না?

—এটা চাওয়া নয়। অশিক্ষিত হলেও তুমি এই কাজটা পারতে। অনায়াসেই পারতে।

—তুমি অন্তত বুঝতে চাইবে ভেবেছিলুম।

—আমি বুঝে কাজ নেই। আর বুঝে কী হবে? আমি এখন বিয়ের কথা ভাবছি।

—বেশ তো।

—কিন্তু তোমাকে নয়। কোষ্ঠী-গোত্র মিলিয়ে। অন্য কাউকে। আমি চমকে উঠলুম। সপ্রশ্ন চেয়ে রইলুম ওর দিকে। ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণের চেষ্টা করলুম। মনে হল, ও বেশ রোগা হয়ে গেছে। ওর কথা বলার ধরনটাও পালটেছে। এত কঠিনভাবে আগে কখনো কথা শুনি নি পারুর মুখে। বোধহয় আমিও এইবার কঠিন হব। বললুম, হেরে গিয়েছ তুমি। তোমার মুখে একটিও আর বড়ো কথা মানায় না। সবটা অভিনয়। চিরকালের দুর্বল জায়গায় বসে সবটাই তুমি অভিনয় করছ।

—আর কেউ হারে নি? তুমি হার নি? হারের লজ্জা একলা আমার? আসলে সবাই এক সময় সমাজের কাছে হারে। তুমি তার থেকে আলাদা দাবি করতে পার?

—পারি। এক্ষুনি পারি। চরণবাবুর বাইরেও আমার জগৎ আছে। পারুর খুব কাছে সরে এসে আমি বললুম। পারু আর্দ্র হল। ওর অবনত মুখে গভীর নৈঃশব্দ্য এসে জমছে। সাঁকোর খুঁটিতে কলকল জলের শব্দেরা অপপ্রিয়মান। জেলেনৌকোর দাঁড়ের ছপছপ ভেসে আসছে হাওয়ায়। নিকটবর্তী হয়ে আসছে। কবজি উলটে সময় দেখতে চাইলুম আমি। মাটিতে শুনশান ঝিঁঝিঁর ডাক শুনলুম। গয়েশপুরের বিধিবদ্ধ সন্ধ্যার আলোয় চোখ রেখে বললুম, রাত হয়ে এল। চলে যাও।

পারু কিছু বলল না। আস্তে কয়েক পা বাড়াল। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে নিবিড় একাত্মতায় বলল, তুমিও এসো। অন্তত একটা দিন আমার বাবা-মা দুজনকে এইভাবে দেখুক। কান পাতলে পাতুক। তুমি এসো।

পারু নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। আমি ভাবলুম। না হলে বাড়ির মনে পুরোনো যন্ত্রণা জাগিয়ে না দেবার কথা মনে পড়ছে না কেন ওর? পথে এখনো ঘরফিরতি মানুষের আগাগোনা। বহু-জনের পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। পুরোনো কথা নতুন করে জাগবে। বাঁচবে আবার বহুদিন। এইসব ভুলে থাকছে, এ কোন্ পারু? পথের পাশে অশ্বত্থতলায় রথীন আর আমি শুয়েছিলুম বোশেখ দুপুরে। শেকড়ের ওপর। পারু আসছিল আপনমনে। চরের ওপর বাথানের গোরু ছেড়ে দিয়ে আমাদের উলটোদিকে দিবানিদ্রা সারছিল বছর বারোর বামাপদ। আমি মাথা তুলে পারুর পানে চেয়েছিলুম অপলক। দেখতে পেয়ে রাগ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল ও। পরে এই নিয়ে ধমকেছিল একচোট। সেই পারু আমাকে এখন ভাবিয়ে তুলেছে। সেই পারু এই নিকষকালো গড়ানো সন্ধেয় আমাকে নিয়ে বাড়ি যেতে চায়।

বললুম, ভেবেচিন্তে বলেছ?

বলল, এসো।

—আরেকজনকে বিয়ের কথা মনে আছে তোমার?

—এসো তো।

—অবুঝ হচ্ছ।

—তা-ই না হয় হলাম। মাত্র একটা তো দিন। একটু আলাদা। এসো তুমি।

এগিয়ে চলেছে পারু। শব্দহীন সায় মেনে আমিও এগোচ্ছি পাশাপাশি। কেউ কথা বলছি নে। আমার জুতোর দোকানটা এখনো খোলা থাকে দীর্ঘক্ষণ। বন্ধের দিন বলে নিশ্চিন্ত রয়েছি। পারুর সাথে এখন তাই যাওয়া চলে। তবু এক-একবার না যাবারই মন হচ্ছে। পারুর ওপর ভয়ানক রাগ-দুঃখ জমছে তখন। আমি যেন এক্ষুনি বড়ো কিছু অঘটন ঘটাতে চাইব। কঠিন আক্রোশে পারুর একখানা হাত চেপে ধরে বলতে চাইব, যা কখনো পারতে পার না, স্বপ্ন দেখতে কে বলেছিল? কে বলেছিল ইউনুছ আমেদকে স্বপ্ন দেখাতে? ইউনুছের পরিচয়কে তুমি অপমান করে যেতে চাও? বলা হল না। যা বলতে চাচ্ছি, কোনো কথাই আজ বলা হয়ে উঠছে না। বললুম, গিয়ে কাজ নেই, পারু। আমাকে ফিরতে দাও, ফিরতে যখন হবেই।

চলতে-চলতেই পারু আমার খুব কাছে সরে এল। ওর আঁচল উড়ে গায়ে পড়ল আমার। মিষ্টি-মৃদু গন্ধ উড়ল। শিরশিরিয়ে উঠলুম। আমার অঙ্গ ছুঁয়ে পারুর ঘ্রাণ। বলল, সহজ হও তো।

—কৃপা করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে? এই নির্মম প্রশ্নটি খুলে দিতে চাইতেই কারো কৌতূহলী টর্চের অহঙ্কার লেপটে পড়ল গায়। এই এক মস্ত বদখেয়াল গ্রাম্য মানুষের। কৌতূহলের অন্ত নেই। যেন টর্চ জ্বালানো মস্ত কোনো বাহাদুরি!

—একদিন কিন্তু উলটোটাই ছিলে তুমি। মনে আছে?

—ছিলুম। পারু মিত্র-ইউনুছ আমেদের জন্মগত সমাজপার্থক্যও ভাবতে বলেছিলুম। ভাব নি কেন? আজই বা কেন ভাবছ?

—হয়তো পারি নি। হয়তো আজ পারছি।

বুড়ো বটের তলায় তখন অর্বাচীন অন্ধকার। ভেঙে পড়েছে। দুর্ভেদ্য। খুব কাছের পারুকেও প্রায় ঠাহর করতে পারছি নে। খশখশ আওয়াজ তুলে হাঁটছি আমরা। দু-একটা থেকে কুকুর ককিয়ে উঠছে হঠাৎ! বললুম, রাগ করছ পারু?

পারু হাসল। শব্দ করে। ঝনঝন করে। বলল, একটুও তুমি বদলাও নি দেখছি। এরকম আরো কতদিন থাকবে বলো তো?

নির্মেঘ আকাশের তলায় অনেকদিন বাদে দুজন এই-ভাবে হাঁটলুম। কথা বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলছি বার-বার। আজ এই দৈবাৎ-দেখার আগেও আমি পারুর জন্যে বাক্য গুছিয়েছিলুম। সবই তোলা হয়ে রইল। আমি পাট ভাঙতে পারছি নে। বোধহয় পারার নেই আমার। গয়েশপুরের সাঁকোয় এলে এবার থেকে অন্য কোনো দৃশ্যকল্প গড়তে হবে আমাকে। দিন ফুরোবার আবিররঙ জলের অপেক্ষায়, সুখছবির অপেক্ষায়, পারুর সাথে দেখা হবার ভিত্তিহীন অপেক্ষায় আর থাকব না। কিংবা বেশি করেই থাকব। আর ভাবব, এই ইউনুছ আমেদ, 'চরণবাবু'র মালিক এই ইউনুছ আমেদের জন্যে এসব বড়োই বেমানান। হাঁটতে-হাঁটতেই আমি এই হেঁটে যাওয়াকেই এখন যেন বিশ্বাস করতে পারছি নে।

পারুদের বাড়ির সামনে এসে গিয়েছি। পথের ধারে উঠোন। উঠোন-পাশে ছিমছাম ঠাকুরঘর। ওপাশে আমজামরুলের গাছগাছালি। আমার সাইকেলের হ্যানডেল ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল পারু। আমিও দাঁড়ালুম। বিজলি আলোয় দালানে কেউ বসে আছে দেখছি। ভেবে নিচ্ছি, এখনো আমার না যাওয়াটাই উচিত হবে কিনা।

—তুমি যেন গোমড়ামুখো হোয়ো না। অনায়াসে কথা বলবে। হাসবে। একদিন সবাই হেরে-যাওয়া কাকে বলে বুঝে নিক। তুমি বুঝিয়ে দিও।

উঠোন পেরিয়ে এসে দাঁড়ালুম জামরুলের তলায়।

কেউ আমাদের দেখল না। নিরিবিলি ঠাকুরঘরেই বসব, একটু দাঁড়াও—বলে দ্রুত পারু এগিয়ে দরজার শেকল নামিয়ে দিল। ডাকল। আমি সাইকেলের স্ট্যানড নামিয়ে বারান্দায় উঠলুম। হাওয়া বইছে, তবু গুমোট গরম কাটছে না। বুকের বোতাম খুলে বারকতক ফুঁ দিলুম জোরে। মেঝেয় মাদুর পাতল পারু। পা ছড়িয়ে বসলুম। আমার সামনে ওদের ঠাকুরের বাঁধানো ছবি। দুরকম দুখানা। নিচে ঘট-ফুল-পাতা। ধূপের ছাই ছড়িয়ে আছে। গন্ধ মোছে নি। সন্ধেয় পুজো হয়েছে, বোঝা যায়।

—একটু বোসো। বাবা-মাকে তোমার কথা বলে আসি। দেরি হবে না।

বাধা দিয়ে বললুম, বাড়াবাড়ি কোরো না। তোমার ওপর ঝড় উঠুক চাই নে; আমি চললুম। কেউ যদি দেখে ফেলে জানতে চায়, বোলো অনিতেশের খোঁজে এসেছিলুম।

পারুকে এইবার যেন চিনে নিতে পারছি। নিষ্পলক। দৃঢ়তা ওর চোখে। ওর মুখে প্রত্যেকটা অভিব্যক্তি চেনা হয়ে ফুটছে। দু বছর আগের পারুকে এইবার খুঁজে পাচ্ছি। বলল, পিছিয়ে-পিছিয়ে এ কোথায় চলে গেছ? অবশ্যই বসবে। আমি আসছি।

এবং অবশ্যই বসে রইলুম আমি। স্থাণুবৎ। নিজের ওপর তীব্র রাগ হল, কিছুতেই কেন এসব কিছুকে ধিক্কার দিতে পারছি নে আমি? ওদের ঠাকুরের ছবি-দুটোকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলুম। স্মিত হাসি। আমার চোখেই আটক চোখ। দক্ষিণের খোলা জানালায় হাওয়া ঢুকে পাদদেশের ফুলপাতায় কাঁপন দিচ্ছে। মেঝেয় মাদুরের ওপর বসে আছি ইউনুছ আমেদ। পারুদের ঠাকুর সেই একই হাসি হাসছে।

—উনিই আমাদের ঠাকুর। পুজো-আচ্চা মানেন না। অথুশিই হন। মা তবু সকাল-সন্ধে ওকাজটা করবেই। দরজার চৌকাঠে কখন পারু এসে দাঁড়িয়েছে, দেখি নি। চোখ ফেরালুম। মাদুরের একপাশে ও বসল। বসল, মা ওপাড়ায় রমাদিদের বাড়ি। বাবা—

—ওঁর কথা বলো। বললুম আমি। আমাকে এই পুজোর ঘরে বসতে দিয়ে তুমি নিয়ম ভাঙতে চাও? তোমার ঠাকুর তা মেনে নেবেন তো? এবং এই কথা বলতে পেরেই আমি ফুরফুরে তৃপ্তি পেলুম। কোনো দুঃখবোধ রইল না আমার। এবং মুরুব্বি মানুষের মতন তক্ষুনি পারু উত্তর করল, হ্যাঁ নেবেন। ওঁর কাছে জাতপাত নেই। ওঁর বহু মুসলমান শিষ্য দীক্ষা নিয়ে মুসলমানই আছে। মানুষের জয়গান ওঁর দীক্ষামন্ত্রে।

পুজো-পাওয়া ছবি দুটো বারবার দেখলুম আমি। অনেকক্ষণ দেখলুম। এই অবক্র অবকাশটুকুর জন্যে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালুম হয়তো। কেননা, এখানে এখনই পারু মিত্রের সাথে আমার শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে। একই সরলরেখায় আমরা আরো খানিকদূর এগোতে পারি বিরল-স্বচ্ছন্দে। এই চার-দেয়ালে আমাদের মনে কারো দেয়াল তুলবার অধিকার নেই।

—চুপিসাড়ে চলে গিয়েছিলে কেন বলবে না?

নীরবতার মৃত্যু হল। বললুম, কাজ নেই আর কাসুন্দি ঘেঁটে। কবে তোমার বিয়ে?

—মাস দুয়েক দেরি। তোমার ভয়ে-ভয়েই হয়ে যেত এতদিন। আমি রাজি ছিলাম না।

—আমাকে ভয় কেন?

—ওটা বাবার। একদিন বুঝি সাঁকোয় তোমাকে দেখল। সে কী দুশ্চিন্তা! হাসি পায়।

আবার নীরবতা। পারুর মুখের আধখানা আঁধারে রহস্যময়। মাটির দিকে নত হয়ে আছে। বলল, তুমি এবার সংসারী হও। ধর্মকর্ম করো। সেটাই ভালো।

মগরেবের ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমার কানের পরদায় পারুর কথাগুলো এশা নামাজের আজান হয়ে বাজল। যেন শুনতে পেলুম মুয়াজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠ। আশ্‌হাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ···।

এই মাহে রমজানে এশা পেরিয়ে তারাবিহের জামাত। …ছোবহানা জিল্ মল্কে অল্ মালাকুতে…অল্ ইজ্জাতে অল্ আজমাতে…অল্ কুদ্রতে অল্ কিবরিয়াতে…। বললুম, ছিঃ পারু। এক সময় তো সাহসের দম্ভ ছিল তোমার—।

হাসল ও। বলল, তা দেখিয়ে লাভ নেই আর। যা হবার নয় এখন—

ওকে একরাশ ঘৃণায় ডুবিয়ে আমার কি এখনই চলে যাওয়া কর্তব্য নয়? অথবা ওকে মারাত্মক কিছু শুনিয়ে যাওয়া দরকার? এইসব ভাবনার ফাঁকে সাইকেলের বেল বাজিয়ে উঠোনে নামল কেউ। পারুর বাবা দরজায় উঁকি মেরে দেখলেন। দাঁড়ালেন। ব্যস্তভাবে পারু বলল, ইউনুছদা। সাঁকোয় দেখা, আসতেই চাইছিল না। প্রায় ধরেই এনেছি।

পারুর বাবার মুখের রেখায় পরপর দুবার পরিবর্তন দেখলুম। প্রথমবার আশঙ্কা-বিরক্তি। দ্বিতীয়বার কিঞ্চিৎ স্বাভাবিকতা। যেন আমি একটা ঘোরতর অপকর্ম করেছি এবং উনি তা ক্ষমা করেছেন। বললেন, তা বেশ। বোসো, ইউনুছ। জামাকাপড় ছেড়ে আসছি এখনই। বসেছিলুম, বসেই আছি আমি। ভেতর-বাড়িতে ঢুকলেন পারুর বাবা। পারুকে বললুম, খুব শেয়ানা হয়েছ দেখছি। এবার বাপে-ঝিয়ে ঝগড়া করো। আমার ছুটি।

দ্বিধাহীন চাঞ্চল্যে আমার হাত চেপে ধরল পারু। আমাদের চার-হাত একত্রিত। ঘটনার শেষ অঙ্কে এ দৃশ্য আমি কল্পনাতেও আনি নি। স্তব্ধ হলুম। কেমন একরকম বোকা হয়ে যেতে থাকলুম। ভালো লাগার কথাও আমার মনে আসছে না। বলল, তার আগে বলতে হবে, উঁচু আশার ইউনুছ কি সত্যি-সত্যিই বিকিয়ে গেছে?

প্রত্যয়ে বললুম, না।

—তবে একটা উপায় বলো। আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলতে চাই নে।

পারু আমাকে অবিশ্বাস করছে না। আশ্বস্তেও আশ্চর্য হলুম। হাত সরিয়ে নিচু গলায় বললুম, তবে আজই তুমি আমার সাথে চলে আসতে পার। নতুন করে ভাবতে বসব না। পারবে?

ও তবুও অবিশ্বাস করছে না। একটুও সন্দেহ নেই ওর কোথাও। বলল, পারি। কিন্তু পারতে গিয়ে আমার যে ভয় হয়েছে খুব। মা-বাবার লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ে যায়। তোমার মা-বাবার অপমানের কথা ভাবি। তাছাড়া পারু মিত্র আমি, যদি রোকেয়া কিংবা জাহানারা হতে হয়, মানিয়ে নেব কী করে? অথচ দু বছর আগে কত সহজেই পারা যেত!

ডুমুরের ডালে কয়েকটা বাদুড় ডানা ঝাপটে কিচির মিচির করছে অনেকক্ষণ। পারুদের ঠাকুরের ছবিতে চোখ রেখে কান দিলুম সেইখানে। স্বর নামিয়ে বললুম, এরকমই এক ঠিকঠাক সন্ধেয় তোমার সাথে প্রথম কথা হয়েছিল। মনে আছে?

নিস্পৃহ উত্তর, আছে।

—কী একটা ছোটোখাটো আয়োজন ছিল যেন?

—দাদার জন্মদিন। বাইশতম। ওর নেমন্তন্নেই তুমি এসেছিলে। রবি ঠাকুরের কবিতা পড়েছিলে। মনে আছে।

—হাততালি দিয়েছিলে তুমি।

—ভালো লেগেছিল তাই।

—তোমাকে গান করতে বলেছিলুম। কর নি।

—জানতাম না।

বাদুড়েরা বোধহয় ঝগড়া বাধিয়েছিল সেদিন। উৎপাত করেছিল খুব। বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম। পারুর বাবা এলেন ধুতি ছেড়ে লুঙি পরে। গায়ে গেঞ্জি। বসলেন। ইসারায় পারু আমাকে সহজ হতে বলল। আমি অস্বাচ্ছন্দ্য এড়াতে চাইলুম। পারুর বাবার সাথে সময় কাটল। দেশের ভয়াবহ রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে তাঁর সব মন্তব্যেই সহমত দিলুম। আমি এখন জুতোর কারবারি শুনে ভুরু কোঁচকালেন একবার। মন খুলে কথা বাড়াবার চেষ্টা করলুম। অল্প হাসির কথাতেও বেশি-বেশি হাসলুম। অনিতেশের খবর নিলুম। অনিতেশ এবং মাসিমা সম্বোধনে পারুর মায়ের সাথে দেখা না হবার দরুন দারুণ আফশোসের কথাও জানালুম।

পারুদের উঠোন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি এখন। পুবের গাছগাছালির মাথার ওপর আকাশভরা তারার আবছা আলো। মায়া-মায়া রঙ। দূরে কোথায় হিট ছবির হিন্দি গান বাজছে। সাইকেলে চড়ে বসলুম আমি। উঠোন থেকে নিজের মানুষের মতন পারু বলল, সাবধানে যেয়ো। আমি কথা বাড়াতে চাইলুম না। আধো-আঁধার পথের ওপর পেডালে চাপ দিলুম জোরে। খোলা হাওয়ায় পাঁজর ভরে শ্বাস নিলুম। পারুদের বাড়ি ক্রমেই পিছিয়ে যেতে থাকল। হারিয়ে যেতে থাকল। সরু যমুনার চরাভূমির আলপথ পার হয়ে নির্জন ক্লান্ত সাঁকোয় এসে দাঁড়িয়েছি আমি।

বুকের বোতাম আটকে দিয়ে বিড়ি ধরালুম একটা। জলের ভেতর কালো আকাশভরা তারার মালা। রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়লুম। তারার মালার চকমকি ঢেউয়ে ভাঙছে বারবার।

মদনাতলার বাজার এখনো অনেকক্ষণ জেগে থাকবে। আমার দোকানের ছেলেটি এ সময় বসে-বসে হাই তোলে, আজ তারও হাই তোলার দিন নয়। 'গোবিন্দ মুদি ভাণ্ডার'-এর গোবিন্দ কাকাকে খুব মনে পড়ে গেল। অনেক দিন ধরেই আমার বিয়ের জন্যে লেগে আছে। শুনেছি, পাত্রীর নাম তহমিনা। থাকে বেড়াচাঁপার কাছাকাছি। হাইস্কুল পাশ দিয়ে এখন ঘরে বসে ধর্ম-বই পড়ে। দেখতে ভালো। ধর্মেকর্মে সুমতি। আমার আব্বা-মা অমন পাত্রী হাতছাড়া করতে চান নি। হালকালে রোজানামাজ করে, সে পাত্রী বউ করে পাওয়া নাকি বড়ই ভাগ্যের। আমি তবু অরাজি ছিলুম। এই নিয়ে মনকষাকষি। সে আজ মাস-কয়েক হল।

সাঁকো ছেড়ে এপারের পথে সাইকেল ছোটালুম। আজ আর সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব মেলাতে হবে না। ভাবছি, গিয়েই আগে গোবিন্দকাকার সাথে দেখা করতে হবে। হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না গোবিন্দকাকা। বেড়াচাঁপার তহমিনার খবর নেব আমি।

শতাব্দীর প্রেক্ষিতে মোহিতলালের প্রতিভার বিচার

আজহারউদ্দীন খান্

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) তাঁর জীবদ্দশায় একদা কবি হিসেবে তাঁর দীপ্ত খ্যাতির ম্লান প্রতিমা যখন দেখে গিয়েছিলেন তখন সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রমরমা ছিল। শতাব্দীর প্রান্তে এসে আজ কী কবি হিসেবে, কী সমালোচক হিসেবে, কোনো পরিচিতিতেই তিনি দীপ্তিমান নন—শুধু একটি নামে পর্যবসিত। তাঁর নিয়তি এরকম হবার কথা নয়। প্রথমত তিনি যখন কবি হিসেবে আবির্ভূত হন তখন তাঁর কবিতা রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার অন্যতম নিদর্শন বলে সে সময়কার কল্লোল-কালি-কলমের তরুণ কবিরা তাঁকে যজনযাজনের পুরোহিতরূপে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার মধ্যে কী এমন ছিল যা প্রকাশ হওয়ামাত্রই কোলাহল তুলেছিল এবং কী জন্য তাঁর কবিতা আজকের দিনে পাঠককে আকৃষ্ট করে না—শতবর্ষের আলোকে সেটা বিচার করা যাক। দ্বিতীয়ত তাঁর সমালোচক সত্তা তাঁর কবিসত্তাকে অতিক্রম করে এক দুর্ধর্ষ সমালোচক হিসেবে তাঁকে বিপুল খ্যাতি যে একদা এনে দিয়েছিল, সেটিও কেন আজকের দিনে ম্লান হয়ে গেল? শতাব্দীর প্রেক্ষিতে সেটাও যেন আমাদের ভাবনার মধ্যে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সৃষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্ত হইতে সহস্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।' (সাহিত্যের সামগ্রী) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাববস্তু সীমাবদ্ধ। শুধু নতুন ভঙ্গি নতুন রীতি নতুন রূপে চিরন্তনভাবকে প্রকাশ করাই কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। কবিতায় মোহিতলাল যা বলেছেন তা বাঙলা সাহিত্যের মানসিকতার বাইরের বস্তু নয়, পরিচিত বস্তুরই নবরূপায়ণ। ইন্দ্রিয়-সচেতন সৌন্দর্যপ্রীতি ও দেহপ্রীতি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮-১৯২০) মধ্যে ছিল। তাকে কাব্যে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

মোহিতলাল মজুমদারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সাহিত্য একাডেমী -আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

করেছেন, মিনমিনে গলায় নয়, পৌরুষের সঙ্গে তাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছেন মোহিতলাল। একদিকে জননীর কল্যাণীমূর্তি, অপরদিকে ভাবে প্রেমে প্রেয়সীমূর্তির বিচিত্র আকর্ষণ তিনি অনুভব করেছেন। লাবণ্যের লীলানিকেতনে একসঙ্গে কুলবধূ যশোধরা ও বারবধূ বসন্তসেনাকে ভালোবেসে তৃপ্তির অবসাদে তিনি উপলব্ধি করেছেন অনাবৃত দেহশ্মশানে চুম্বনের চিতা-ভস্ম পড়ে থাকে—সবকিছু অবশেষে স্মৃতি হয়ে যায়। নারীদেহেই ফুটে ওঠে সৌন্দর্যসুষমা—দেহগত ভালো-বাসাকে যাঁরা পাপ বলে মনে করে থাকেন মোহিতলাল তাঁদের দলে নন—দুরন্ত জীবনপিপাসাই তাঁর ধর্ম। সেজন্য লোকপ্রচলিত নৈতিক এবং অনৈতিক ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন—এই বিদ্রোহঘোষণাই সেদিন তাঁকে খ্যাতির সামনের সারিতে এনে ফেলেছিল। তাঁর মতে, মানুষের অহং-বোধই ভালোমন্দের ধারণা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের রোম্যানটিক সৌন্দর্যপ্রীতি, দেবেন্দ্র-নাথ সেনের রূপমোহ, সত্যেন দত্ত-নজরুলের আবেগ-প্রবণতায় মোহিতলাল আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম-দিককার কবিতায় সেই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে বলিষ্ঠ ভোগবাদের মধ্যে তিনি রূপজ মোহের সঙ্গে বিদগ্ধ মননের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-অনুকারী কবিদের মোহিতলাল 'ছাতারের দল' বলে উপহাস করতেন। রবীন্দ্র-কাব্যের বহিরঙ্গের অনুকরণ যেমন হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রবিরোধিতাও কম হয় নি। রবীন্দ্রবিরোধিতা তিনিও কম করেন নি, উত্তেজনামুহূর্তে তাঁর কিছু-কিছু উক্তি শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছিল। কিন্তু সর্বজনীন ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিজ ব্যক্তিত্বকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যাকে বাদ দিয়ে বাঙলা সাহিত্য কল্পনা করা যায় না। মোহিতলাল এই তথ্যটি কোনো সময়ই বিস্মৃত হন নি। রবীন্দ্রবিরোধিতার আন্দোলনে তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম কবিরূপে রবীন্দ্র-বিরোধিতার সম্মান দিলেও মোহিতলাল আন্দোলনের অসারতা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সেদিক দিয়ে তিনি পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "শনিবারের চিঠি"-তে প্রকাশিত 'সত্যবাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইয়াছে বা হইবে ইহা লইয়া এত আক্রোশ বা আস্ফালনের ঘটা কেন? ঢাক বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথকে 'ভুয়ো' দিবার এই প্রবৃত্তি কেন? প্রথমত, কোনো যুগ শেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ একটি নূতন যুগের আবির্ভাব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইলেই কি রবীন্দ্রনাথের আসন ভাঙিয়া পড়িবে? তাঁহার প্রতিভার সেই অভ্রভেদী চূড়া পূর্ব ও পশ্চিম তোয়-নিধি পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের মানদণ্ডস্বরূপ বিরাজ করিবে না?' পাশ্চাত্যের অন্যান্য কবিদের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রপ্রতিভা যাচাই করার যে মানসিকতা, তারও তিনি সমালোচনা করেছেন। তুলনামূলক সমালোচনায় হীনম্মন্যতাই প্রকাশিত হয়েছে। ওইসব কবিরাই যেন রবীন্দ্র-প্রতিভাবিচারের কষ্টিপাথর, তাঁদেরকে বিচারের মাপকাঠি না করলে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা যায় না। এরকম মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করে ১৯৩৬ সালে লিখিত এক পত্রে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে আমি যতটুকু শ্রদ্ধা করি তাহার অধিক শ্রদ্ধা যে করে সে হয় মূঢ়, নয় স্তাবক ভণ্ড। আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইতে পারি; কিন্তু শেলী ব্রাউনিং বা সেক্সপীয়রকে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বপ্রতিষ্ঠার যে উদ্যম, ততখানি ভক্তি আমার নাই—যদি থাকিত তবে আমি ধর্মভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে যাইতাম,—আমার আত্মার মৃত্যু হইত।' (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ ১৭১) রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিময় রূপসৃষ্টির প্রতি মোহিতলাল বরাবর শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কবিতা রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের রোম্যানটিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন—সেজন্য অনেকেই তাঁকে রবীন্দ্রানুসারী

কবিদের দলে ফেলে থাকেন। অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারীর আত্মবিলোপে তিনি সতর্ক হয়ে যান—নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অচিরকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই "কল্লোল-কালি-কলমে"র তরুণ কবিরা তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে অতিরিক্ত কিছু পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে আধুনিকতার পুরোধা হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেই অতিরিক্ত পাওনাটা হচ্ছে বাঙলা কবিতার তৎকালীন এলায়িত ভাবনাকে এপিক গাম্ভীর্যে রূপায়িত করা, পাতলা রসকে ঘন মিহরিতে পরিণত করা। বৈষ্ণবভাবধারার "সখী সখী ধরো ধরো" ভাবকে বিদূরিত করে অতিপ্রত্যক্ষ মানবিক কামনা-বাসনাকে মাংসল পেশীর সংযোগে জীবন আর জগৎকে ভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মোহিতলালকে বাঙলা কবিতায় বিশিষ্ট করেছিল।

জন্মেছি যে মর্ত্যলোকে ঘৃণা করি
ছুটিব না স্বর্গে মোরা মুক্তি খুঁজিবারে।

কিংবা—

দেহে তোর প্রাণ আছে? তবে কেন ওরে ভীরু
নিত্য-উপবাসী
চিরমৃত্যু-মোক্ষ-অভিলাষী?
(মোহমুদ্গর : বিস্মরণী)

অথবা—

আঁখি অনিমিখ, মেটে না পিপাসা,
এ দেহ দহিতে চাই।
(ব্যথার আরতি : বিস্মরণী)

এই মাংসল পেশীর সরল ঘোষণাই তাঁকে পাঠকদের প্রিয়কবি করে তুলেছিল।

তাঁর সমকালে আর যে দুজন কবি—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর নজরুল ইসলাম—পাঠকদের কাছ থেকে যে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন তাঁদের দুজনের সঙ্গে মোহিতলালের বক্তব্যের পার্থক্য ছিল। তাঁরা তিনজনে তিনটি সুরের সন্ধান দিয়েছিলেন। নজরুল প্রধানত সমাজসংসারের অনিয়ম-অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা-আন্দোলনকে তীব্র করে তুলেছেন, জনতার সঙ্গে সহমর্মিতা অনুভব করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সমাজের প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ আর শ্লেষ কটাক্ষ করেছেন আর মোহিতলাল বৈষ্ণবীয় ভাবুকতা এবং গার্হস্থ্য-প্রেমনির্ভর রোম্যানটিক স্বপ্নবিলাসের মধ্যে প্রচণ্ড জীবনীশক্তি অর্থাৎ তান্ত্রিকের দেহাত্মবাদী জীবনদর্শন সঞ্চার করেছিলেন। তা করতে গিয়ে দেশের শাক্ত-ধারাকে তিনি যেমন অনুসরণ করেছেন তেমনি সেই ধারাকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে পাশ্চাত্য কবিদের ভাষা এবং রূপও গ্রহণ করেছেন। রক্ষণশীল ভারতীয়দের মতো সোপেনহাওয়ার নারীবিদ্বেষী ছিলেন। "বিস্মরণী"র "মোহমুদ্গর", "পাস্থ" কবিতায় ভোগবাদী মোতিলালের জীবনদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। এই দুরন্ত জীবনপিপাসার মধ্যে তাঁর অকৃত্রিম পৌরুষ প্রকাশিত যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কথায় 'তাল-ঠোকা-পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।' বৈরাগ্যমুখিতা নয়, ইহলৌকিক যাবতীয় সৌন্দর্য উপভোগ করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

ধর্মের ধ্বজা রেখে দাও দূরে—
মন্ত্রে-তন্ত্রে প্রাণ নাহি পুরে!
আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে
বুকে করি লব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
(মৃত্যু : স্বপনপসারী)

কিংবা

দেহ ভরি কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি খুঁড়ি লও কামনার কাঁচমণি-হীরা।
অন্ন খুঁটি লব মোরা কাঙালের মত
ধরণীর স্তনযুগ করি দিব ক্ষত
নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দর্শন-আঘাতে করিব
জর্জর—
আমরা বর্বর।
(মোহমুদ্গর : বিস্মরণী)

তাঁর ভোগবাদে বিরহের ব্যঞ্জনা ছিল বলেই 'দেহের মাঝারে দেহাতীত ক্রন্দনসঙ্গীত' তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। নারীদেহকে তিনি পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে তিনি দেহকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর নারীদেহবর্ণনা পঙ্কিলতায় ক্লিন্ন হয়ে ওঠে নি। যুলকে গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে যেমন অসময়ে শুকিয়ে যায়, মোহিতলালও জানতেন পৃথিবীর দৈনন্দিন সৌন্দর্যবোধ থেকে দেহকে বিচ্ছিন্ন করলে দেহের মৃত্যু ঘটে। গাছে যেমন ফুল শোভাবর্ধন করে, গাছ আর ফুল যেমন পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি পৃথিবীর রূপলোক থেকে নিজের সৌন্দর্যানুভূতিকে নারীদেহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে তিনি দেখেন নি—পৃথিবীর সৌন্দর্য আর নারীদেহের সৌন্দর্য তাঁর কাছে এক এবং অভিন্ন হয়ে আছে। সেজন্য তিনি দেহ কামনা করেন নি, তাঁর প্রেম দেহ আর আত্মার সম্মিলনে এক অপূরন্ত দাহিকাশক্তি। দেহ নশ্বর, এর ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে, আর দেহের মধ্যে আত্মা আছে বলে এটি অমৃতঘট। আত্মা দেহে প্রাণসঞ্চার করে আর প্রেম দেহ আর দেহাতীতকে এক করে দেয়। তাই দেহের আধারে আত্মার লীলাময় ব্যাখ্যানই তাঁর দেহাত্মবাদের প্রধান বিশেষত্ব। তিনি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন 'জীবনজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'জীবনের মূলে আছে কাম বা ভোগ-প্রবৃত্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রবৃত্তিমার্গই জীবনের ধর্মমার্গ, কারণ সেই পথেই জীবনের পূর্ণতা বা অবসান ঘটে। শক্তিমাত্রেই স্বাস্থ্য—জীবনের শক্তিও এই প্রবৃত্তির শক্তি। যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়—সেই মানুষই তত জীবন্ত তত স্বাস্থ্যবান; যাহার আকাঙ্ক্ষা যত ক্ষুদ্র সে-ই তত অসুস্থ। মানুষমাত্রেরই ভোগপিপাসা আছে, কিন্তু সকলের শক্তি নাই, সাহস নাই, তাই তাহারা সর্বপ্রকার নীচতা ও শঠতার শরণাপন্ন হয়; তাহারাই অধার্মিক, তাহারা জীবনের অবমাননা করে।... জীবনকে যে এমন করিয়া ভোগ করিতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করে; তাহারা কামনা শেষে মর্ত্যলোক ছাড়াইয়া যায়—প্রবৃত্তির বেগ যত বাড়িয়া যায়, ততই ইহার ইন্ধন আর মেলে না; তখন সে জীবনের শেষ দেখিতে পায়, তাই মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে।' (মন-মর্মর পৃ ২৩৭-৩৮) দেহমিলনের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে জীবনের চেতনাকে জগতের সামগ্রিক ঐক্যের সঙ্গে গ্রথিত করাই তাঁর কবিধর্ম ছিল। এজন্য তাঁর কামনা-বাসনা ইন্দ্রিয়লালসায় পরিণত হয় নি। বিদ্যাসুন্দরের মতো অশ্লীল রতি-ক্রিয়ার কাব্য হয়ে ওঠে নি কিংবা "বিবর"জাতীয় আত্ম-সমীক্ষার নামে খিস্তি-খেউড়ের পরনোগ্রাফি হয়ে ওঠে নি। তিনি একটি নতুন মাত্রা কবিতায় সংযোজন করেছিলেন বলেই তরুণ কবিরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু মোহিতলালের মতো দেহ ও দেহগত কামনাকেই সত্য বলে মনে করেন, আর তিনিই তাঁর দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। মোহিতলাল বলেছিলেন—'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা।' বুদ্ধদেব বসু বললেন—

একমাত্র কামনা অমর;—
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা
স্বপ্ন যে ভাঙিয়া যায়, ভুল হয়ে যায় ভালোবাসা—
দূর তারকার তরে দুরূহ দুরাশা।
... ...
কবির কল্পনা নহ, চিরন্তন অশ্লীলতার তুমি বিধাতার
অনঙ্গ-বিহার-ভূমি, তুমি মূর্তি মর্ত্যকামনার;
আর কিছু চাহি নাকো;—জানি জানি তব চক্ষে
নাহি স্বর্গজ্যোতি—
তপ্ত তনু নিঙাড়িয়া পরিতৃপ্তি ঢেলে দাও
হে জন্ম-অসতি!
(মোহমুক্ত : বন্দীর বন্দনা)

প্রেমেন্দ্র মিত্রও সৃষ্টির রসে উন্মত্ত হবার কথা বলেন—

যৌবনের মায়ালোকে

অনাদি ক্ষুধার সেই অনির্বাণ জ্বালা নিয়ে চোখে,
এসো নারী, আরো কাছে এসো
বুকে বুকে রেখে শুধু ক্ষণিকের তরে মোহ ভরে
ভালবাসো।
... ...
সৃষ্টির প্রথম-প্রাতে বিধাতার মনে
যে-কথাটি ছিল সঙ্গোপনে
সে গোপন বারতাটি করিব প্রকাশ,
এসো নারী, এল আজ জীবনের দখিনা বাতাস।

মুখে নয়, শুধু বুকে বুক দিয়ে নয়,
ব্যঞ্জনা-ব্যাকুল সর্ব অঙ্গ মোর, মন প্রাণ দিয়ে
শিখাইব সে রহস্য প্রিয়ে!
জানিবার দুরন্ত আগ্রহে
তোমারও দেহের মাঝে শোণিতের বন্যাবেগ বহে!
(যৌবন-বারতা : প্রথমা)

মোহিতলালের দেহগত বর্ণনার সঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতারও কিছু ভাবের মিল দেখা যায়—

তুমি আছো, আমি আছি, আর আছে
দেহ-ভোগবতী
সুন্দরী অসতী।
(সার্থক : প্রিয়া ও পৃথিবী)

কবিতার পঙক্তির মিলও দেখা যায়। যেমন—

আমি এসেছিনু পথ ভুল করি তোমাদের
খেলা-গেহে,
স্নান করিবারে তোমাদের ভিজা অশ্রুজলের স্নেহে;
আমারে ভুলিয়ো ভাই,
ভালো যদি বাসো, ভুলিবার মতো সহজ কিছুই
নাই।
... ...
আমি আসিব না ফিরে,
আমি চলে যাই তীর্থপথিক তিমির তমসাতীরে॥
(৩-সংখ্যক কবিতা : অমাবস্যা)

এরই সঙ্গে মোহিতলালের "বিস্মরণী"র নামকবিতা মিলিয়ে পড়ুন—

আমারে তোমরা ভুলে যেয়ো ভাই!
এসেছিনু পথ ভুলে—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্তিনাশার কূলে!

জীবনানন্দ দাশের প্রথম দিককার কবিতায় মোহিতলালের ছায়া লক্ষ করা যায়। "মোহমুদ্গর" কবিতায় মোহিতলাল যেমন জীবনপ্রীতির কথা বলতে গিয়ে আবার মানবজীবন ফিরে পাবেন কিনা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি জীবনানন্দও ভেবেছিলেন—

আবার পাব কি আমি ফিরে
এই দেহ!—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি!
(পিপাসার গান : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আবদুল মান্নান সৈয়দও জীবনানন্দের প্রথম দিককার কবিতার ওপর মোহিতলালের প্রভাব বলতে গিয়ে বলেছেন, 'দুই কবিই রূপাম্বেষী। দুজনের আকাঙ্ক্ষার ভাষাও এক হয়ে দেখা দিয়েছে : মোহিতলালের 'কামনা' (স্বপনপসারী) ও জীবনানন্দের 'যে বাসনা নিয়ে' (ঝরাপালক) কবিতাদ্বয়ের পাশাপাশি স্থাপনায় তার সাক্ষ্য প্রাপ্তব্য।' (জীবনানন্দ দাশ ও পূর্বজেরা : নির্বাচিত প্রবন্ধ পৃ ২০৫, ঢাকা মুক্তধারা ১৯৭৬) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় জীবন-মৃত্যু-প্রেম-নিয়তি বর্ণনায় এবং তৎসমশব্দবহুল দীর্ঘচরণ রচনায় ক্লাসিক গাম্ভীর্য আর শাক্তসুর মোহিতলালের কথা মনে করিয়ে দেয়—

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥
(হৈমন্তী : অর্কেস্ট্রা)

তবু মোহিতলাল কবিতায় শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। যে দীপ্তিময় বীর্যময় ঘোষণা নিয়ে একদা তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেটি গভীর ভক্তি-চেতনার এক তাত্ত্বিকতায় গিয়ে পৌঁছোয়। "স্বপন-পসারী"র জীবনবাদ 'বিস্মরণী'তে সংহত হয়ে উঠেছে কিন্তু 'স্মর-গরল'-এ গিয়ে তিনি অধ্যাত্মরাজ্যের জালে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন। যৌবনের আবেগতপ্ত রৌদ্রপ্রখর দিনগুলো তখন বিদায় নিয়েছে, স্পর্শকাতর মনে সেদিনের স্মৃতিগুঞ্জরণই তাঁর শেষ কাব্য 'হেমন্ত-গোধূলি'র প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে—

পূর্বগগনে চেয়ে থাকা মিছে শুকতারকার লাগি—
জানি, এ রজনী পোহাবে না হেথা, কেন আর
বৃথা জাগি!

তিনি আর জেগে থাকার প্রয়োজনবোধ করলেন না। এই নৈরাশ্য তাঁকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে—জীবনসায়াহ্নে এসে কী কবিতায় কী সমালোচনায় নৈরাশ্যের আঁধার আর কাটে নি। দেশের জন্য যুবকের আত্মত্যাগও তাঁর কাছে অর্থহীন ঠেকেছে, তাকে জীবনের পরাজয় বলে মনে করেছেন (প্রশ্ন : হেমন্ত-গোধূলি)। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবোধও তাঁর কাছে অলীক বলে মনে হয়েছে। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের স্বজাতি-ও স্বদেশ-প্রীতির প্রশস্তি করতে শুরু করেছেন, বঙ্গসংস্কৃতির প্রকৃত বাণীমূর্তি বলে তাঁদের মনে করেছেন। আশাবাদী কবিরা সাধারণত বর্তমান অবক্ষয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরেন, কিন্তু মোহিতলাল সেদিকে না গিয়ে পিছু হটতে শুরু করলেন। পুরাতনের মোহে বর্তমানের অবক্ষয়ে একটুও আশার আলো দেখতে পেলেন না। যে কবি-মন একদা তীব্রতম ভোগাত্মবাদের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে কবি-দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিল, সেই দৃষ্টি শেষের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে গেল—কবিতাপ্রবন্ধসমালোচনায় তিনি এমন পশ্চাদভিমুখী হয়ে উঠলেন যে তাঁর অনুরক্ত পাঠকের পক্ষে তাঁর প্রতি ভালোবাসা বজায় রাখা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল। "স্বপন-পসারী", "বিস্মরণী" যতটা পাঠকের প্রিয় হয়ে উঠেছিল, সেই পরিমাণে "স্মর-গরল", "হেমন্ত-গোধূলি" পাঠকের মনকে টেনে রাখতে পারে নি। তখনকার তরুণসমাজ তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির পঙক্তিই পথেঘাটে আওড়িয়েছেন। আর মোহিতলালও শেষের দিকে আধুনিক কাব্যাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দিলেন।

ব্যবধান বেড়ে ওঠার আরও কারণ আছে। মোহিতলালের কবিতার বীর্যবান পৌরুষের দিকটি তরুণ কবিরা গ্রহণ না করে নিছক রতিসাধনার দিকে অত্যধিক মনোনিবেশ করার ফলে "কল্লোল-কালি-কলমে"র সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় সৃষ্টির বৈচিত্র্যের নামে তাঁরা শুধু পাশবিক আদিমতাকে রূপ দিতে লাগলেন, তার মধ্যে কোনো জীবনদর্শন খুঁজে পাওয়া গেল না। মোহিতলাল এরই বিরুদ্ধে "শনিবারের চিঠি"-তে তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন। তখন তাঁর নিজেরও রোম্যান্টিক নীলাঞ্জন কেটে গেছে—ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছেন (১৯২৮ জুলাই)। সাহিত্যের রসরূপ পরিবর্তিত হতে থাকে—কবিতা থেকে সমালোচনা-সাহিত্যের দিকে তাঁর মন ঝুঁকতে থাকে। সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব দেখে সমালোচক সত্তার প্রতি যত বেশি নিবিষ্ট হয়েছেন আধুনিক মনোভাব থেকে তত তাঁর ব্যবধান বেশি বাড়তে থাকে। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যের মূলনীতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাতে গিয়ে সমালোচনা-সাহিত্যকে এক নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। "ভারতী"-র মাসকাবারি শেষে "শনিবারের চিঠি"-তে এসে সমুন্নতিলাভ করেছে। এই পর্বে তাঁর কবিসত্তা লুপ্ত হয়ে সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়ে হয়ে পড়ে। নিখিল ভারত বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতি হন (১৩৩৭)। স্বতোৎসারিত ভাবধারায় "স্বপন-পসারী" (১৩২৮), "বিস্মরণী" (১৩৩৩) কাব্যগ্রন্থের জন্ম হয়েছিল। সেই ধারা ক্রমশ শুষ্ক হতে থাকে, তত্ত্বের ভারে গুরুভার হয়ে উঠতে থাকে—"স্মর-গরল" (১৯৪৩), "হেমন্ত-গোধূলি" (১৩৪৮)-র কবিতা পাঠককে টেনে রাখতে পারে নি, আর মোহিতলালের

মধ্যেও আনন্দময় অনুভব আবেগময় ভাববস্তুকে তাঁর সমালোচক সত্তা ক্রমশ প্রতিহত করতে থাকে। যে মোহিতলাল ভোগারতির তীব্রতা পাঠকসমাজের মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন, সেটি তাঁর হাতেই ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। ফলে মোহিতলাল যে এককালে কবিতা লিখেছিলেন একথা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রজন্মের পাঠকরা ভুলতে থাকেন। একথা তিনিও স্বীকার করেছেন, 'আমি যে কখনও কবিতা লিখিয়াছিলাম তাহা এতদিনে পাঠকসমাজ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আমারও মাঝে মাঝে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।' আর সমালোচক হিসেবেও মোহিতলাল আজকের দিনের পাঠকদের মনকে তৃপ্তি দিতে পারেন নি। কারণ, প্রথমত, নিজস্ব মনগড়া মতবাদকে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বাঙালিত্ব বা বাঙালিয়ানাকে খুঁজতে গিয়ে রক্তনির্ধারণতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। তৃতীয়ত, আপন বক্তব্যে অবিচল থাকতে গিয়ে কল্পিত অকল্পিত বস্তু ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করে অধৈর্য-অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থত, আধুনিক বাঙালি জীবনের সবকিছু মন্দ আর উনিশ শতকের বাঙালির সবকিছু ভালো, এইরকম একটা আত্মগর্বিত আবেগের দ্বারা চালিত হতে গিয়ে সর্বভারতীয়বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঁচাবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন যা আজকের দিনে বিচ্ছিন্নবাদের পরিচয় দেয়। তা বলে একথার অর্থ এ নয় যে সমালোচক হিসেবে তিনি ব্যর্থ, বরং তাঁর সমকালে সমালোচনা-সাহিত্যের দীনতাই তাঁকে সমালোচনা-সাহিত্য রচনার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। নব্য-সমালোচনা-পদ্ধতির প্রবর্তকরূপে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। তিনি মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের ওপর যে আলোচনা করেছেন তাকে আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি। দেশ ও সমাজের নানা ধরনের অব্যবস্থা তাঁকে ক্ষিপ্ত করেছিল। বিশেষভাবে গান্ধীজীর বাঙালিদের প্রতি অবহেলা এবং দেশবিভাগের পর বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বহীনতা দেখে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে তিনি সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়কার তাঁর মানসিক অবস্থা "বাংলার নবযুগ" (১৩৫২), "জয়তু নেতাজী" (১৩৫৩), "বাংলা ও বাঙালী" (১৩৫৮) এবং "বঙ্গদর্শন" ও "বঙ্গভারতী" সম্পাদনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বজাতির চৈতন্যসম্পাদনই তাঁর একমাত্র কাজ ছিল। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হবে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পুরোমাত্রায় পালন করেছিলেন—তার মধ্যে মতান্তর যাই থাক না কেন। একজন বাঙালি হিসেবে দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে নিরলম্ব সাহিত্যসেবার প্রতি বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'এতদিন জীবন আর সাহিত্য এ দুটো আমার কাছে এক ছিল—জীবনের যেটুকু স্বাদ তা আমি সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলাম। আজ সেই স্বাদ আমার দেহে মনে কোথাও নেই, তাই সাহিত্যও বিস্বাদ হয়ে গেছে। আমাকে আপনারা সাহিত্যিক বলে যে একটুখানি খাতির এখনও করেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে এও জানবেন যে, আমি যতটুকু বাঙালি ততটুকুই সাহিত্যিক; আজ সেই বাঙালি জাতটাই আমার চোখের সামনে মরে গেল,—বাঙলা সাহিত্যে আমার কি কাজ!' (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ ১৪১) হিব্রু প্রফেটদের মতো তিনি সত্যসন্ধানী, তাদের মতোই তিনি কণামাত্র অনাচার সহ্য করতে পারেন নি, অন্যায় ও অসত্যের স্পর্ধিত আস্ফালনে তিনি তাদের মতোই ক্ষিপ্ত হয়েছেন, স্বজাতির চৈতন্য জাগরিত করার জন্য দেহের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তাদের মতোই জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। শতবর্ষে কবি হিসেবে বা সমালোচক হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ যদি কার্পণ্য করেন, তবে একজন বাঙালি হিসেবে জাতির উদ্ধারকর্তারূপে তিনি যে নিবেদিতচিত্ত ছিলেন—সেকথা বিস্মৃত হলে অবিচার

করা হবে।

মোহিতলাল মানুষ হিসেবে ষোলো আনা সৎ ছিলেন, মনে-মুখে এক ছিলেন। তাঁর কাছে সাহিত্য ছিল ধ্যানজ্ঞান—সারাজীবন সাহিত্য নিয়ে ছিলেন, আমাদের মতো পার্ট-টাইম শৌখিন সাহিত্যিক ছিলেন না। আর দশটা ব্যাবসার মতো উনি সাহিত্য-ব্যবসায়ী ছিলেন না, ধান্দাবাজিও তাঁর ছিল না, কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশীও ছিলেন না, কোনো স্বার্থের দ্বারা তিনি চালিত হন নি—সাহিত্যকে তিনি সাধনার স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন—যেজন্যে তিনি সাংসারিক জীবনে বহু ক্ষতি স্বীকার করেছেন, দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন, বহু নিন্দা-কুৎসা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করেছেন, তবু আত্মোন্নয়নের জন্য এক মুহূর্তও সাধনার আসন থেকে কোনো-কিছুর বিনিময়ে নীচে নেমে আসেন নি, কারুর সঙ্গে আপোসরফা করেন নি। সাহিত্যই তাঁর কাছে ছিল বাঁচার ইষ্টমন্ত্র। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'সাহিত্যই আমার জীবনের একমাত্র সাধনা,—একমাত্র ধর্ম; উহাতে কোনও মিথ্যা বা মোহ যুক্ত হইলে আমি বাঁচিতাম না। লোকে অর্থরসে, যশোরসে, অথবা স্নেহরসে বাঁচিয়া থাকে—তোমাদের মতো সাহিত্যিক কেহই আমার মতো কেবল সাহিত্যরসে বাঁচিয়া থাকিতে রাজি নহে।' (মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ ১৭২) তাই সাহিত্যকে ধ্যানজ্ঞান করার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি তিনি ছাড়া আর কেউ নেই—এ ধারার একক উদাহরণ তিনিই ছিলেন, এখনও আছেন এবং হয়তো ভবিষ্যতেও থেকে যাবেন। আজকের দিনে ক্ষমতাবান সমালোচকের অভাব নেই কিন্তু সাহিত্যের কল্যাণকে জাতির কল্যাণের সঙ্গে একাত্ম করে দেখার লোক বিরল। তাই সাহিত্য, দেশ আর জাতির জন্য আজকের দিনে এরকম শহিদ আর কেউই হন নি, শতবর্ষস্মরণসভায় এটিও তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের অন্যতম উপচার হোক।

সবশেষে তাঁর এক ,প্রাক্তন ছাত্রের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার ঘটাব। প্রখ্যাত নীরদ সি চৌধুরী তালতলার হাই স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিলেন। কত যত্ন নিয়ে পড়াতেন তার আভাস নীরদ চৌধুরী 'The Autobiography of an Unknown Indian' (1951) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বুঝতে পারি শিক্ষক হিসেবেও তিনি কত পরিশ্রমী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শিক্ষকরা প্রধানত হবেন সাধক, সাধনাই একমাত্র কাজ।' শিক্ষকতাকে তিনি বৃত্তি বা পেশা হিসাবে নয়, ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কী শিক্ষকতা, কী অধ্যাপনায় সর্বত্র তাঁর সাধকরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে এই আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'Thy Hand Great Anarch : India 1921-1952' (1987) বেরিয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পাঠচ্ছেদে (Literary Apprenticeship) মাস্টার মশায়ের কাছে তাঁর ঋণের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে 'আমার শিক্ষক ও নির্দেশক' (my teacher and guide) বলে অভিহিত করেছেন (পৃ ১৩১-১৪১) আর তাঁর মৃত্যু দিয়ে আত্মজীবনী প্রায় শেষ করেছেন। নীরদবাবুর বাঙালিদের সম্পর্কে নিন্দাবাদ সুবিদিত, কিন্তু শিক্ষকের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার এমন নিদর্শন আজকের দিনে সুলভ নয়। আর মোহিতলালও ছাত্রের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড পড়ে মোহিত হয়েছিলেন এবং ছাত্রের অভিমতকে অনেক ক্ষেত্রে সমর্থনও করেছেন। এই আত্মজীবনীতে তিনি নানা জায়গায় মোহিতলালের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিছু-কিছু কৌতুককর বিষয়ও রয়েছে যা দিয়ে মোহিতলালের চরিত্রকে বুঝে নেওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মোহিতলাল সামান্য বিষয়ে চট করে রেগে যেতেন, তেমনি নিমেষেই ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মোহিতলাল খুব সচেতন ছিলেন। একবার অমল হোমের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে রাগারাগির কথা নীরদবাবু উল্লেখ

করেছেন। অমলবাবু নিজের বিয়ের কার্ড বাঙলা পুঁথির অনুকরণে খুব সুদৃশ্য আকারে ছেপেছিলেন। মোহিতলাল কার্ড পেয়ে খুশি হয়েছিলেন, কার্ডের কারুকার্যও তাঁর ভালো লেগেছিল। যা ভালো লাগত তা সবাইকে দেখিয়ে আনন্দ পেতেন। ছাত্রকেও দেখাতে এলেন। ছাত্র নিছক কৌতুকবশত বললেন যে অমল হোম এর চেয়েও সুন্দর কার্ড ছেপেছেন, তার কাছে এ কার্ড কিছুই নয়। যেই বলা মোহিতলাল রেগে গেলেন, বললেন কী, আমাকে অবজ্ঞা করে সাধারণ কার্ড দেওয়া হয়েছে, বিয়েতে আমি যাব না। নীরদবাবু তাঁর রাগ মানালেন। বিয়ের নিমন্ত্রণে মোহিতলাল গিয়েছিলেন (পৃ ৩৭৭)। নতুন-নতুন প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ ছিল। এরকম ঘটনার কথা নীরদ চৌধুরী নিজের জীবনের উদাহরণে দাখিল করেছেন। তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর "মডার্ন রিভিউ" পত্রিকার ১৯২৫ নভেম্বর সংখ্যায় মোহিতলালের উদ্যোগ আর উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের হাতে প্রবন্ধটি দিয়ে আসার কথা মোহিতলাল ছাত্রকে বলেছিলেন। তার আগে অশোকবাবুর কাছে নীরদবাবুর লেখা ও পড়াশুনার প্রশংসা করেছিলেন, ফলে প্রবন্ধ জমা দিতে গিয়ে নীরদবাবু অশোকবাবুর কাছ থেকে খুবই ভদ্র ব্যবহার পেয়েছিলেন যা তিনি আশা করেন নি। মোহিতলাল ওই রচনার প্রুফ ছাত্রকে এনে দিয়েছিলেন, কীভাবে প্রুফ দেখতে হয় তাও শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এমন-কী রচনা প্রকাশের দরুন সম্মানদক্ষিণাও ছাত্রের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন (পৃ ১৪১)। কবি ও সমালোচক হিসেবে মাস্টার-মশায় তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান নি বলে নীরদবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাস্টারমশায় যথোপযুক্ত সম্মান পান, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হোক এবং তাঁকে নিয়ে আলোচনা হোক—এরকম একটি আকাঙ্ক্ষা নীরদবাবু আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে মাস্টারমশায়ের লেখা should have remained one His poetry was human and universal. and had no passing politics in it ···He would also have succeeded as a pure literary critic. His taste in literature was impeccable and infallible. I never saw him fall a victim to the spurious and shoddy however popular it might be, nor did I even find him inclined to deny the merit of a story or poem as story or poem because it was by one of his enemies. His ideological prejudices did not operate in regard to literary quality. (p 912) তাই জন্মশতবর্ষে তাঁর রচিত সাহিত্যে লুপ্ত হারানো কণিকা খুঁজে নেবার তাগিদই আমাদের আলোচনার বিষয় হোক।

সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে ?

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

"ভারতীয় সাহিত্য" বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে তর্ক থাকলেও "ভারতীয় সাহিত্য" শব্দটি এখন যথেষ্ট প্রচলিত। এটি আধুনিক কালে প্রথম কে কোথায় কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তা উদ্ধার করা বোধ হয় গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার। তবে মনে হয়, প্রথম দিকে "ভারতীয় সাহিত্য" বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হত "ভারতীয় সাহিত্যসমূহ", অর্থাৎ এটিকে ব্যবহার করা হত একটা বহুবচনাত্মক শব্দ হিসেবে—বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যেসব সাহিত্য রচিত হয়, তারই সমাহার যেন ভারতীয় সাহিত্য—সংস্কৃত থেকে ইংরেজি ভারতবর্ষে বসে যে ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হয়েছে বা হচ্ছে, তা-ই ভারতীয় সাহিত্য—এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে ব্যাকরণ অনুসারে বলতে হয় "ইনডিয়ান লিটারেচারস্"। একবচনাত্মক ভারতীয় সাহিত্য সহজে স্বীকৃতির যোগ্য বিবেচিত হয় নি; তার প্রাথমিক কারণ সাহিত্যকে সাধারণভাবে ভাষার ভিত্তিতেই বিচার করা হয়। ভারতবর্ষ নামে একটি দেশ, রাষ্ট্র আছে, ভারতীয় নামে একটি জাতিও আছে আশা করা যাক। যদিও দেশের সীমানা বা রাষ্ট্রের চেহারা ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে পালটেছে, আবার ভারতীয় জাতি নিয়ে তর্ক তুলবার মানুষও আছে। কিন্তু ভারতীয় নামে একটি ভাষা নেই, কোনো কালে ছিলও না। ভাষা আছে অথচ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য নেই, এ অবস্থাটা মানা গেলেও, ভাষা নেই সাহিত্য আছে—এ অবস্থাটা হঠাৎ মানতে অনেকের মনেই দ্বিধা জাগতে পারে। একটা ভাষা থাকলে সে ভাষাতে সাহিত্যও গড়ে ওঠে ধীরে-ধীরে। তবে সে সাহিত্য উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে কি না, তা নির্ভর করে নানা কারণের উপর। ভাষা নেই সাহিত্য আছে—এ অবস্থাটা শুনতে যতই অদ্ভুত মনে হোক, দৃষ্টান্ত দিলেই মেনে নিতে আপত্তি থাকবে না যে এমন অবস্থা হতেই পারে। অস্ট্রেলীয় সাহিত্য বললে নিশ্চয়ই অস্ট্রেলীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বোঝায় না। অস্ট্রেলীয় বলে কোনো ভাষাই নেই আদপে।

আদিবাসী মাওরিরা টি'কে থাকলে কী হত বলা যায় না যদিও। এখন অস্ট্রেলীয় সাহিত্য রচিত হয় নিপাট ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের কেতাবে অস্ট্রেলীয় সাহিত্য, বা এমন-কী আমেরিকান (বা আমেরিকী) সাহিত্যও ঠাঁই পায় না। ইংরেজি সাহিত্য বলতে বোঝায় ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজির সাহিত্য নয়। অর্থাৎ ইংল্যানডবাসী মানুষের সাহিত্য। কেউ যদি ইংরেজি সাহিত্যের বিশ্ব-ইতিহাস রচনা করেন তা স্বতন্ত্র কথা। তবে অস্ট্রেলীয় বা আমেরিকান সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু ইংরেজি ভাষার সূচনাপর্ব, ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহ্য সূত্রে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রসঙ্গ থাকবে আশা করা যায়। আবার ইংরেজি সাহিত্যের বিশ্ব-ইতিহাস যদি রচিত হয় সেখানে আমেরিকান বা অস্ট্রেলীয় কেন, ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের কথাও থাকবে—মনোমোহন ঘোষ থেকে রাজা রাও পর্যন্ত। তবে সাধারণভাবে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বলতে ইংরেজের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসই বোঝায়। ইংল্যানডবাসী মানুষ যেহেতু একটি ভাষাতেই কথা বলেন বা সাহিত্য চর্চা করেন, সেহেতু এক্ষেত্রে অন্যতর বিভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। কিন্তু কানাডিয়ান সাহিত্য লেখা হয় দুটি ভাষাতে—ইংরেজি আর ফরাসিতে। সে বিচারে কানাডিয়ান সাহিত্য কোনো একভাষিক সাহিত্য নয়। আফ্রিকার বিচার একেবারেই স্বতন্ত্র। ব্যবহারের সময় আফ্রিকান (আফ্রিকী) সংস্কৃতি, আফ্রিকান সাহিত্য, আফ্রিকা-নিজ্‌ম্ অনবরত বলা বা লেখা হয়ে থাকে। একটা সমগ্র মহাদেশের এমন একটি সদৃশ চরিত্র গোটা দুনিয়ায় আর নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতা ব্যবহার করলেও, যে অর্থে য়ুরোপীয় সভ্যতা ব্যবহার করা হয় সে অর্থে আফ্রিকান সংস্কৃতি প্রযুক্ত হয় না। একটা মহাদেশের নামেই যেন এঁদের অস্তিত্ব। য়ুরোপের দেশজ অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আফ্রিকান সাহিত্য বলা যা এশীয় সাহিত্য বলাও তাই। কিন্তু এশীয় সাহিত্য ব্যবহৃত হয় না কদাপি। আফ্রিকান সাহিত্য আফ্রিকা মহাদেশের কোনো একটি ভাষায় রচিত সাহিত্য নয়। অথচ এই হতভাগ্য মহাদেশের পরিচিতি এতকাল গোটা আফ্রিকার নামেই বাইরে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতিকালে যদিও আফ্রিকার নানা দেশ তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয় দাবি করছে। এবং সেটাই তাঁদের স্বাভাবিক পরিচয়। কলকাতায় বসবাসকারী এক কেনিয়ান ছাত্র তাঁকে আফ্রিকান বলায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আপত্তি করে বলেছিলেন, It is as good as introducing you as an Asian! আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, আবার বিগত ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যসূত্রে কেউ আবার ফরাসি বা ইংরেজিতে সাহিত্য-চর্চা ক'রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এবারে আসা যাক স্পেনের প্রসঙ্গে। স্পেনের মানুষ একদিন পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসতি স্থাপন করেছিল। আমেরিকার একটা বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে এখনও স্পেনীয় ভাষাই হল প্রধান ভাষা। চিলি, গুয়াতেমালা আর কলমবিয়ার চার-চার জন সাহিত্যে নোবেলপুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন স্পেনীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে। আর স্পেন বা এস্পানিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে পেয়েছেন দুজন। নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিচার না করলেও স্পেনীয় সাহিত্য আজ কি স্পেনদেশীয় সাহিত্য মাত্র? যদিও লাতিন আমেরিকার দেশে-দেশে যে স্পেনীয় সাহিত্য-চর্চা চলছে তাঁরাও স্পেনীয় সাহিত্যের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের নিবিড় সম্পর্ককে অস্বীকার করেন না। সেরভেনটিসকে নিয়ে তাঁদেরও গর্ব। তবুও স্পেনীয় বিশ্ব-সাহিত্য আর চিলি বা গুয়াতেমালা বা কলমবিয়ার সাহিত্য-ইতিহাস নিশ্চয়ই চরিত্রগতভাবেও সদৃশ হবে না। এই সূত্রে গুয়াতেমালার নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী আস্তুরিয়াগের 'মুলাটা অ্যানড দি ফ্রাই (ইংরেজি অনুবাদে এই নাম) উপন্যাসে যে আদিবাসী শ্বেতাঙ্গ এবং আফ্রিকী তিন ধারার উল্লেখ আছে, সেটাই বোধ হয় লাতিন আমেরিকার স্পেনীয় সাহিত্যের ভিত এবং সমস্যা।

স্পেনীয় সাহিত্য ছেড়ে আরও ঘরের কাছে আসা যেতে পারে। ভাষার বিচারে সাহিত্যের নামকরণ তো একেবারে উঠে যায় নি। বরং সেটাই এখনও প্রচলিত দস্তুর। উর্দু সাহিত্যের কথা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ দু-দেশেই খুবই উৎসাহের সঙ্গে উর্দু সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত আছে। দুদেশের উর্দু সাহিত্যকে পৃথক-ভাবে উল্লেখ করতে গেলে বলতে হবে ভারতীয় উর্দু সাহিত্য এবং পাকিস্তানি উর্দু সাহিত্য। যদিও পাকিস্তানি উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে দেশ-বিভাগোত্তর ভারতীয় উর্দু সাহিত্যের উল্লেখ না থাকলেও, প্রাক-বিভাগ উর্দু সাহিত্যের উল্লেখে ভারতীয় উর্দু সাহিত্যকে সে বাদ দিতে পারবে না। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় যদিও আরও কিছু সমস্যা থেকে যেতে পারে। যেমন, ধরা যাক দেশবিভাগের পর কোনো উর্দু লেখক ভারত ভূখণ্ডে থেকে সাহিত্য সাধনা করলেন। কিন্তু, কিছুকাল পরে চলে গেলেন পাকিস্তানে বা যদি কারও ক্ষেত্রে এর উলটো ঘটনা ঘটে থাকে সেক্ষেত্রে দাগটা টানা হবে কীভাবে। কে লিখেছেন বা কোন্ ভাষায় লিখেছেন তাতেও চিহ্নিত করা যাবে না। কোথায় এবং কখন লিখেছেন সেটাও জানা থাকা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ নিয়ে যে সমস্যা সে তো আরেক ধরনের। সে কথায় পরে আসা যাবে।

সিন্ধি সাহিত্যের সমস্যায় আরেকটি মাত্রা যোজিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে সিন্ধি একটি স্বীকৃত ভাষা, যদিও সিন্ধিভাষীদের হোমল্যানড নেই ভারতবর্ষে। আক্ষরিক অর্থে উর্দুরও নেই। তবে আগেকার সংযুক্ত প্রদেশে বা এখনকার উত্তর প্রদেশে উর্দুর চর্চা ছিল, তার ধারা এখনও অব্যাহত আছে। সেখানে উর্দু ভাষা মাত্রেই উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন নি। সিন্ধিদের মধ্যে যাঁরা ধর্মগতভাবে মুসলমান তাঁরা পাকিস্তানেই রয়ে গেলেন। আর উদ্বাস্তু হিন্দু ধর্মা-ধর্মাবলম্বী সিন্ধিরা ছড়িয়ে পড়লেন ভারতের নানা প্রান্তে। এই কলকাতাতেও সিন্ধি জনসংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। জনসংখ্যার চেয়েও বড়ো কথা—কলকাতা-বাসী সিন্ধিদের ইসকুল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বেশ চমকে দেবার মতো রয়েছে। সিন্ধি ভাষা শুধু যে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে তাই নয়, সাহিত্য অকাদেমিও এই ভাষাকে একটি সাহিত্যিক ভাষা বলে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ দেশবিভাগোত্তর ভারতবর্ষে সিন্ধি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রয়েছে। সাহিত্য অকাদেমির সূত্রে অনেকের মনে পড়ে যেতে পারে যে, সাহিত্য অকাদেমির প্রথম সচিব ছিলেন সিন্ধিভাষী শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী। সিন্ধিদের মূল ভূখণ্ড পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধি লেখা হয় ফারসি আরবি হরফে। ভারতে যে উদ্বাস্তু সিন্ধি এসেছেন তাঁরা ধর্মাচরণে হিন্দু। এঁদের একটি বড়ো অংশ ধর্মের প্রতি আনুগত্যবশতই হোক বা নিজেদের ভারতীয়ত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবার তাগিদেই হোক অথবা ভারত সরকারের সুনজরের প্রত্যাশায় নাগরী লিপিতে সিন্ধিচর্চা শুরু করেছেন। হয়তো তাঁরা ভেবেছেন নাগরী লিপিতে লিখলে ভারত সরকারের আনুকূল্য সহজ হবে। যদিও তা হয় নি। সাহিত্য অকাদেমিতে সিন্ধি ভাষা নাগরী লিপিতে স্বীকৃতি পায় নি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে এবং সিন্ধি সাহিত্যপ্রেমীদের একটি অংশের দাবিতে তাঁদের মূল ভূখণ্ডে সাহিত্যের সঙ্গে যোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে ফারসি আরবি হরফের ব্যবহারের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবেচনায় এটিই হয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত। যদিও ভারতে বসবাস-কারী সিন্ধিরা কতকাল এই হরফে সিন্ধি সাহিত্যচর্চা এবং শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবেন তা ভবিষ্যতের বিবেচনায়। ভারত সরকারের নাগরীপ্রীতি এবং সরকারি আনুকূল্যপ্রত্যাশীদের সংযোগে ভবিষ্যতে কী হবে বলা কঠিন। সিন্ধির ক্ষেত্রে নাগরী বা ফারসি

আরবি কেবলমাত্র একটি লিপিসমস্যারই ব্যাপার নয়। এর গূঢ়তর তাৎপর্য বোঝা যাবে বাঙলা ভাষার দিকে তাকালে। ধরা যাক, যদি পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বু বা ফারসি হরফে বাঙলা ভাষা চর্চার সেই কুখ্যাত প্রস্তাব গৃহীত হত এবং তদনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানেই সেই ভাবেই বাঙলা সাহিত্যের চর্চা চলত, তাহলে এপার-বাঙলায় কি ওপার-বাঙলার সাহিত্য নিয়ে আদৌ আগ্রহ থাকত? লিপির সঙ্গে সংস্কৃতির একটা অমোঘ সম্পর্ক আছে। লিপি থেকে ভাষাকে সরিয়ে নিয়ে গেলে সংস্কৃতির চেহারাও পালটাবে। এ প্রসঙ্গে পালি ভাষার লিপিহীনতা মনে পড়তে পারে। তবে পালি ভাষার সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য স্তরের সমস্যা—সম-সাময়িক কালের সঙ্গে তার সেই যোগ নেই। চীনে যে রোমান লিপি গ্রহণের প্রভূত চাপ থাকা সত্ত্বেও গৃহীত হচ্ছে না, তারও কারণ লিপিকে বাদ দিয়ে ভাষার গতি বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কা আছে। যাই হোক, সিন্ধি ভাষা দুই দেশে এক লিপিতে রচিত হলেও ভারতবর্ষে বসে সিন্ধি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলে সেখানে পাকিস্তানের সিন্ধি সাহিত্যের বিবরণ থাকবে না, যদিও পাকিস্তানে বসে সিন্ধি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলে সেখানে প্রাক-বিভাগ সিন্ধি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে, নইলে ঐতিহ্যপরম্পরা স্পষ্ট হবে না।

তামিল বা হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর-একটি নতুন দিকের কথা ভাবতে হয়। শ্রীলঙ্কা বা মালয়েশিয়ায় যে তামিল সাহিত্য বা মরিশাসে যদি স্বতন্ত্র হিন্দি সাহিত্য গড়ে ওঠে (না ওঠার কোনো কারণ নেই), তাহলে ভারতীয় তামিল বা ভারতীয় হিন্দি-ভাষী সে ভিন্‌দেশী সাহিত্য পড়বার আনন্দ নিশ্চয়ই পাবেন, তবে ভারতীয় তামিল বা হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসে সেই ভিন্‌দেশী সাহিত্য অনুল্লিখিতই থাকবে। এবং ভবিষ্যতে একদিন শ্রীলঙ্কার তামিল সাহিত্য বা মরিশাসের হিন্দি সাহিত্য অস্ট্রেলীয় বা আমেরিকান সাহিত্যের মতো স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হবে নিঃসন্দেহে।

নেপালি এবং বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। দুটি ভাষাই একটি সার্বভৌম দেশের অন্যতম ভাষা, আবার অপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের ভাষা। ভারতবর্ষে বসে নেপালি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলে নেপালের নেপালি সাহিত্যের পটভূমিকা অবশ্য উল্লেখ করতে হবে, কিন্তু নেপালের নেপালি সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতীয় নেপালি সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করলে কিছুই বলার থাকবে না। জানতে ইচ্ছে করে নেপালের নেপালি সাহিত্যের ইতিহাসে ভানুভক্তের উল্লেখ আছে কিনা। বাংলাদেশের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যই প্রাধান্য পাবে এবং পূর্ব পাকিস্তান-পর্বের সাহিত্যচর্চাও সম-প্রাধান্য পাবে। তবে বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে যথাযথ দেখতে চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সে ইতিহাসের গর্বও থাকবে। যদিও ততখানি করবেন না দেশবিভাগ-পরবর্তী কালের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য নিয়ে। পড়া এক জিনিস আর ঐতিহ্যের অন্তরভুক্তি স্বতন্ত্র জিনিস। যদিও যেভাবেই স্যুতো টানা হোক, জীবনানন্দ বা নজরুল নিয়ে গর্ববোধ করছেন দুই বাঙলাই। নজরুল যদিও সাতচল্লিশের আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছেন—সে বিচারে তিনি যুক্ত বাঙলারই সম্পত্তি। বাংলাদেশে জীবনানন্দের স্বীকৃতি এবং চর্চা বোধহয় কোনো ইতিহাস বা ভূগোল মেনে হয় নি। জীবনানন্দের জন্ম বরিশালে, জীবনানন্দের কবিতার গ্রামপ্রকৃতি বাংলা-দেশের প্রকৃতি—এই কারণেই কি তিনি বাংলাদেশের মানুষের আত্মীয় হয়েছেন? এমন কি তার কেউ নেই বা ছিলেন না? তাঁরা সেই আত্মীয়তা পেলেন না কেন? দুই বাঙলার সাহিত্য-ঐতিহ্য নিয়ে নানা টানাপোড়েন চলবে আরও দীর্ঘকাল। যদিও তারই ভিতর দিয়ে দুই বাঙলার সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নটিও ক্রমে পাকা হয়ে আসবে। রাজনৈতিক বিভেদ সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে কিছুটা প্রভাবিত করেই থাকে। এবং সময়ের গতির সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রভাব ক্রমেই

একটা স্থায়ী চেহারা নেয়। দুই বাঙলার সাহিত্য পরস্পরের প্রতি ঔপনিবেশিক দখলের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তা হবে ইতিহাসবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। এখনকার দুই বাঙলার পারস্পরিক সম্পর্ক এক সময়কার বঙ্গদেশ এবং শ্রীহট্টের সম্পর্ক বা এখনকার পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার বর্তমান সম্পর্ক ইতিহাসে কতদিন রক্ষা পাবে তা ভবিষ্যতের বিবেচনায়। আসাম-কবলিত সিলেট এবং ব্রিটিশ-বাঙলার সম্পর্কের মধ্যে যদিও একটা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র-বিরোধী ক্ষোভের স্বাস্থ্য-কর ভিত্তি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সম্প্রীতির প্রধান বা শেষ কারণ ভাষাসাদৃশ্য। কিন্তু ইতিহাস সমস্যা সৃষ্টি করবেই। পশ্চিমবঙ্গে গত চল্লিশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে রচিত সাহিত্য নিয়ে কৌতূহল, আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা থাকলেও তাকে এ-প্রান্তের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তরভুক্ত করা হবে না। বাঙলা কাব্য- বা গল্প-সংকলনেও দুই বাঙলা ভিন্ন আসনেই বসবে। ওপার-বাঙলার সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, এমন কী নজরুল ঐতিহ্যের বিচারে স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু দেশবিভাগ-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আপন ঐতিহ্যের বাইরেই থেকে যাবে। বিভ্রান্তি হয়তো কখনো-সখনো আসবে। যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের অজুহাতে যখন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের "পূর্ব বাংলার গল্প" সংকলন করেছিলেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে ভূগোল দিয়ে ভাগ করার অপচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মহেনজোদারোর ইতিহাস নিয়ে পাকিস্তান গর্ববোধ করে যদি পাকিস্তানের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস রচনা করেন তাহলে শুনতে যতই অস্বাভাবিক লাগুক, তা নিয়ে প্রতিবাদ করা চলে না। আসলে প্রসঙ্গের বিভিন্নতায় ইতিহাসের ভিত্তি এক-একভাবে ধরা হয়।

"ভারতীয় সাহিত্য" শব্দটি সাম্প্রতিক কালে যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি দিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনও তাঁরা সাহস করে ভারতীয় সাহিত্য প্রদর্শনী নাম রাখেন নি—যদিও সেই প্রদর্শনীতে ১৫টি ভাষা-বিভাগের পাশাপাশি আরেকটি বিভাগ ছিল 'ভারতীয় সাহিত্য' নামে। সেই 'ভারতীয় সাহিত্য' বিভাগে ছিল রামায়ণ মহাভারত কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ এদেরই চিরন্তন ভারতীয় সাহিত্যের আধার বা প্রেরণা বলে মনে করা হয়েছিল। তালিকা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, তবে সে তর্ক বর্জনের দাবি নিয়ে নয়—অধিকন্তু কিছু সংযোজনের তাগিদে। "গীতা"কেও কেউ সাহিত্য বলতে পারেন। কেউ বলতে পারেন তুলসীদাস নয় কেন? শরৎচন্দ্রের কথা হয়তো কারও মনে আসবে তাঁর সর্বভারতীয় পাঠক বিচারে। পঞ্চতন্ত্র, কথা-সরিৎসাগর—এগুলিরও সর্বভারতীয় আবেদন আছে বইকি। প্রশ্নটা তালিকাবৃদ্ধির নয়—সর্বভারতীয় আবেদন এবং ভিত্তি আছে এমন সাহিত্যের স্বীকৃতির প্রশ্ন। ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য অকাদেমির সেই প্রদর্শনীটিই আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের সাহিত্যগ্রন্থের প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রদর্শনী। সাহিত্য অকাদেমির ধারণাবাক্য Indian Literature is one though written in many languages বা তাঁদের মুখপত্র Indian Literature প্রচারলাভ করে এরই সমসাময়িক কালে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা হলেও ভারতীয় সাহিত্য এক এবং অভিন্ন—এ উক্তিটি যতই চমকপ্রদ হোক-না কেন, কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তত সহজ নয়। না-হয় ধরে নেওয়া গেল সাহিত্যের পরিচয় ভাষাভিত্তিক নয়, জনগোষ্ঠীভিত্তিক। এবং ভারতীয় জনগোষ্ঠী তার বৈচিত্র্য এবং বৈষম্য সত্ত্বেও একটি জাতি হিসেবে চিহ্নিত। কিন্তু ভারতীয় জনগোষ্ঠীরও তো ভৌগোলিক সীমা চিরকাল এক নেই। সে কখনও কান্দাহার থেকে বঙ্গ, আবার কখনও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও

তার প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপ্তি তার কখনও এত বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মদেশ তো ব্রহ্মপ্রদেশ ছিল তিনের দশকেও। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ব্রহ্মপ্রদেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছেন ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক ব্রহ্ম ভারত থেকে বিযুক্ত হবার পরেও। আডেনও ব্রহ্মের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবিযুক্ত হয়েছে। সাতচল্লিশ সালের আগে 'ভারতীয় সাহিত্য' ভাবনাটি একেবারে অচেনা ছিল না ধরে নিলে সে ভারতীয় সাহিত্যে পরবর্তী কালের পাকিস্তান, পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সবই ছিল। এবং এখন অর্থাৎ এই ১৯৮৮ সালে যে সীমানায় ভারতীয় সাহিত্যকে বাঁধবার চেষ্টা করা হচ্ছে তাও কি একেবারে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা? আবার ভাঙতেও পারে বা জুড়তেও পারে রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে। চারদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী অপপ্রয়াস কি সীমানার নিশ্চিন্ততা আনছে?

সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় সাহিত্য বলতে না হয় আজকের রাষ্ট্রনৈতিক সীমায় আবদ্ধ ভারতে চর্চিত সাহিত্যই বোঝা গেল। কিন্তু ইতিহাস যখন পর্যালোচনা করা হবে, তখন তো শুধু সাম্প্রতিক কালের কাছেই দায়বদ্ধ থাকলে চলবে না। অতীতের ভারতীয় ইতিহাস আজকের রাষ্ট্রনৈতিক সীমার বন্ধন তো স্বীকার করে না। নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটাই স্বীকৃত সত্য। সাহিত্যের ইতিহাসও অনিবার্যভাবে সেই পদ্ধতিতেই নির্ণীত হবে। আসলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আবেগের একটা ভূমিকা থাকবেই। সেই আবেগের সূত্রেই নির্ণীত হবে ভারতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা। তবে সাহিত্যের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ উঠে পড়ে তখনই সমস্যাটি ভিন্ন আকার নেয়। ধরা যাক, একজন ভারতীয় দীর্ঘকাল কোনো-না-কোনো কারণে প্রবাসী, কিন্তু তিনি যদি কোনো ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং কাল তিনি যদি নোবেল পুরস্কারও অর্জন করেন, তখন তাঁর সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত হবে ধরে নিলেও, তাঁর নাগরিকত্ব ভিন্‌দেশীয় হলে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর তালিকায় কি আরেকজন ভারতীয়ের নাম যুক্ত হবে? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন সমস্যা আসে না। খুরানা বা চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার পেলে ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ হয় ঠিকই, যদিও আইনসম্মতভাবে নোবেল-পুরস্কার-জয়ী ভারতীয়দের তালিকায় কোনো নতুন নাম যোজিত হয় না। কিন্তু আবদুস সালামের ক্ষেত্রে তিনিই পাকিস্তানের প্রথম নোবেল-পুরস্কার-জয়ী হলেন, যেহেতু তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন নি। বিজ্ঞানে নাগরিকত্ব দিয়েই বিচার সম্পূর্ণ হতে পারে। কারণ সেখানে ভাষার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভিন্‌দেশের নাগরিক যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় তিনি যদি কোনো ভারতীয় ভাষায় নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন তাহলে এক বিচিত্র সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে মনে হয়। তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইংরেজিতে লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সুতরাং ভারতীয় ভাষার সেই সৌভাগ্য কি হবে?

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভাষা-ভিত্তিকে তেমনভাবে স্বীকার করেন নি। তিনি মনে করতেন সাহিত্যের অভিধা কোনো স্থানকালপাত্রে আবদ্ধ নয়। ভাষাতেও নয়। সাহিত্য মানুষের কথা বলে, যে মানুষ বিশ্ব-চরাচরে প্রায় একই ইতিহাসের ধারা বেয়ে চলেছে, চলেছে একই আবেগের স্রোতে। তাই রবীন্দ্রনাথ Comparative Literature বলতে সাহিত্যের তুলনামূলক বিচার বলতে চান নি—তাঁর কাছে যে ভাষাতেই রচিত হোক, তা যদি বিশ্বমানবের কথা প্রকাশ করে, তাকে তিনি বিশ্বসাহিত্য বলেছেন। কিন্তু এও একটা আদর্শায়িত সংজ্ঞা। বাস্তব ক্ষেত্রে এ নামকরণে কাজ চলবে কিনা তর্কের বিষয়। সেখানে হয়তো বাঙলা সাহিত্য থাকবে, বাংলাদেশী বাঙলা সাহিত্যও থাকবে। আবার ভারতীয় সাহিত্যেও থাকবে। হয়তো বা দক্ষিণ আমেরিকার নির্বাসিত বা দেশত্যাগী লেখকগোষ্ঠী তাঁদের সাহিত্য-চর্চাকে নাম দেবেন দেশত্যাগী লাতিন আমেরিকান সাহিত্য বা এমন কিছু। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক সম্পূর্ণত ছিন্ন হবে না, আবার রাজনৈতিক অবস্থানের দ্বন্দ্ব তাকে নানাভাবে আত্মপরিচয়ে উদ্‌বেজিত করবে। আর ইতিহাস সংস্কৃতি এবং মানুষের আবেগেই সে তার যথার্থ নাম খুঁজে ফিরবে।

বিদ্যাসাগরের ট্র্যাজেডি

সনাতন মিত্র

'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গানের এই কলি যখন শান্তিপুরের তাঁতিরা শাড়ির পাড়ে বুনছিলেন, ধরে নেওয়া যায়, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বেশ বড়ো রকমের একটা হুজুগ অবশ্যই উঠেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রভাব কতটা পড়েছিল, এবং কতদূর স্থায়ী হয়েছিল সে প্রভাব আমাদের সমাজে, এসব প্রশ্ন তুললে, বিদ্যাসাগরের জীবন যতটা গৌরবমণ্ডিত ততটা সাফল্যমণ্ডিত কিনা, সে বিষয়ে অতিশয় বেদনাদায়ক সন্দেহ মনে জাগে। শুধু বিদ্যাসাগর কেন, কোন্ সত্যিকারের বড়ো মাপের মানুষকেই বা তাঁর কৃতকার্যতার মাপে হিসাব করা যায়? বরং মনে হয়, যিনি যত বড়ো, সেইরকম উদ্ভ্রান্ত তাঁর বিফলতা। যাঁরা তাঁদের আশা-ভরসা, ইংরেজিতে যাকে বলে fellow human beings, তাঁদের ওপর স্থাপন করেছেন, সেইসব মহত্তর মানুষদের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বিদ্যাসাগর তাই করেছিলেন। ফলে, শেষ জীবনে এসে তাঁকে লিখতে হল, 'আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম।'

কিছু বন্ধু আর সহযোগী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর কোনো সময়ে ছিল না। 'প্রথম থেকে আমার সঙ্গে নিজেদের বেঁধেছেন এমন কয়েকজন বন্ধুর সমর্থন আর নিজের যথাসাধ্য সম্বলের ওপর নির্ভর করেই আমি এতদিন চলে এসেছি আর চলতে চাই। সামান্য দু-একজন বাদে এই বন্ধুরা এবং আরো যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের কথা এতদিন রক্ষা করে এসেছেন ও এখনো সাহায্য করে চলেছেন।' (বাঙলায় অনূদিত)

বিধবাদের বিয়ে দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বিপুল দেনার দায়ে পড়েছেন, হে বঙ্গবাসী, তোমরা এগিয়ে এসে সেই ঋণের ভার থেকে তাঁকে মুক্ত করো—এই ধরনের আবেদন বাঙলা আর ইংরেজি পত্র-পত্রিকার দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, এ অনুমান করা কঠিন হিল না, এবং তিনি সহায়-সম্বল-বন্ধু-বান্ধবহীন, এরকম কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা হবে, তা যে তিনি চাইবেন না, সেটাও স্বাভাবিক। বিশেষত, যখন তাঁর "বে-হিসেবী" খরচের বহর নিয়েও কথা উঠেছে, তখন পাবলিক চ্যারিটির যে-কোনো প্রস্তাব যে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন, তাতে কারোরই সন্দেহ থাকবার কারণ ছিল না। "হিন্দু পেট্রিয়ট"-এ প্রকাশিত ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'আমি বুঝতে পারছি, মাত্র ৬০ জন বিধবার বিবাহের জন্য ৮২০০০ টাকার মতো এত বড়ো অঙ্ক খরচ হওয়ায় কোনো কোনো মহল অবাক হয়েছেন। কোন্ অবস্থায় এমন হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আমার নেই।'

"বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি" বইটিতে যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন কথা তাতে বিশেষ কিছু না থাকলেও একটা ব্যাপার কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: বন্ধু এবং সহযোগীরাও সবসময়ে তাঁদের 'কথা রক্ষা' করেন নি।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন। তাঁকেই মনের দুঃখে বিদ্যাসাগর চিঠিতে লিখেছিলেন, দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ জানলে তিনি বিধবাবিবাহ নিয়ে অতদূর এগোতেন না। সেই একই চিঠিতে তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখছেন, 'অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীন অর্থমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্ধ এ পর্যন্ত দাও নাই, এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ।'

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে না হয়ে পারে না—ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের সংগ্রহে কদাচিৎ অপর পক্ষের বক্তব্য আমরা শুনতে পাই। যদি পেতাম, ইতিহাস আরও পূর্ণাঙ্গ হত।

যা'ই হোক, আত্মীয়স্বজনের কথা ছেড়েই দিন (তাঁরা না থাকলে মানুষকে বৈরাগ্য শেখাবে কে?), কিন্তু বন্ধুর মতো বন্ধুও যদি বিদ্যাসাগরের থাকত, মাত্র তিন বছর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হলে তাকে উদ্বেশ করে লিখতেন না, 'বোধহয় যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক উত্তরকালে অশেষ যন্ত্রণাভোগ অপরিহার্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে।'

অথচ বাইরে থেকে দেখলে সাফল্য তিনি জীবনে কম পান নি। মোটামুটি ১৮৪২-এ যাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ, ১৮৪৫-৪৬-এর মধ্যেই, অর্থাৎ ২৫-২৬ বছর বয়সেই তিনি গভরনর-জেনারেলকে পরামর্শ দেবার মতো জায়গায় পৌঁছে গেছেন, ৩১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, ৩৪ বছর বয়সে বোর্ড অব একজামিনারসের সদস্য। ১৮৯১ সালে মৃত্যুর পাঁচ মাস আগেও ভারত সরকারের আইনসচিব হিন্দু বালিকার সহবাস সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের আগে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

তাছাড়া ১৮৫৬-তে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হল, তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে গান লোকের মুখে মুখে শোনা যেতে লাগল, এমন-কি শান্তিপুরে শাড়ি বোনা হতে লাগল। বহুবিবাহ বন্ধ করার আইনও, মাঝখানে সিপাহি বিদ্রোহ এসে না পড়লে, হয়তো পাশ হয়ে যেত।

'১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি বাঙলার গভরনর তাঁকে সম্মানপত্র দিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মানুষ, সমাজনেতা এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের যিনি পুরোধা—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ এই মানপত্র দেওয়া হয়।'

কিন্তু ভারতবর্ষের সেই অগ্রগণ্য মানুষটির তখন কী অবস্থা, লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন:

'মনের দিক থেকে তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন, তাঁর জীবনের সকল আকর্ষণ এক-এক করে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মা ও বাবা চলে গিয়েছেন, পুত্রস্থান শূন্য···বন্ধুরা শত্রু হয়ে গিয়েছে···ঋণ করে একটি বিধবা বালিকার বিয়ে দিয়েছেন; পরে জানতে পেরেছেন, স্ত্রীর অলঙ্কার ও টাকা নিয়ে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে। দুঃস্থ ছাত্র ভেবে যাকে সাহায্য দিয়েছেন, পরে জেনেছেন সে প্রত্যহের ব্যবসায়ী।'

সাফল্য নয়, ব্যর্থতার বোধেই ভারাক্রান্ত হয়ে তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন। কিন্তু সাফল্য মৃত্যুর পরেও আসতে পারে। বিদ্যাসাগর কি তা পেয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আমাদের সমাজে কুণ্ঠা এখনও প্রবল। আর শিক্ষা?

"আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর" নামক ছোটো বইটির সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই লেখক দেখিয়েছেন, কী আশ্চর্যজনকভাবে অগ্রসর ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তা। তিনি কী চেয়েছিলেন?

'...let us raise up a band of men....they should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of information and be free from the prejudices of their country.'

তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েছে, আজ—এতদিনেও সে কথা আমরা বলতে পারি কিনা সন্দেহ।

কাজেই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বসতবাড়ি কলকাতার বুকে যদি আজ অবহেলিত, জীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে (যা নিয়ে "বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ি" পুস্তিকায় লেখক আক্ষেপ করেছেন), তবে তা উপযুক্তই হয়েছে। বাঙালির কাছে বিদ্যাসাগর এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করতে পারেন।

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী। বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার। দশ টাকা।

বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি—সন্তোষকুমার অধিকারী। অনন্য প্রকাশন। আঠারো টাকা।

বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী—সম্পাদক: সন্তোষকুমার অধিকারী। বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার। বারো টাকা।

বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাড়ী—সন্তোষকুমার অধিকারী। প্রকাশক: গৌরীশঙ্কর রায়। দুই টাকা।

অবনীন্দ্রচরিতকথা

রণেন্দ্রনাথ দেব

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (১৯০৭-১৯৬৭) লোকান্তরিত হয়েছেন দু-দশকেরও বেশি দিন হল। "অবনীন্দ্র-চরিতম্" হাতে পেয়ে তাঁর স্বাদু রচনাশৈলীর আস্বাদনে আবার পরিতৃপ্ত হলাম।

লেখক অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিত্রকলা শিক্ষা করেছিলেন। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল অবনীন্দ্রনাথকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরকম সুযোগ খুব অল্প লোকই পায়। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে যাওয়ায় বাঙালি পাঠক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। প্রবোধেন্দুনাথ বলেছেন তাঁদের পরিবার আর অবনীন্দ্রনাথের পরিবারে একদা ব্যবধান রচিত হয়ে থাকলেও সেতুর কাজ করেছিলেন তাঁর মামা হিরণ্ময় রায়চৌধুরী—ভারতবর্ষের প্রথম এ. আর. সি. এ. ভাস্কর এবং স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। স্নেহবশত অবনীন্দ্রনাথ তাঁকেও বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দার অন্তরঙ্গমণ্ডলীতে স্থান দেন। প্রবোধেন্দুনাথের কলমে (তুলিতেও বলা চলে) সেসব দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল চিত্ররূপে বিন্যস্ত হয়েছে।

মানুষ অবনীন্দ্রনাথ জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর মাতৃ-প্রীতি, পশুপক্ষীর প্রতি আকর্ষণ, ভাইদের সঙ্গে বন্ধন, গৃহগতপ্রাণতা, নাটকে হাস্যরসসৃজনে তাঁর দক্ষতা—এসব গুণ লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু শুষ্ক বিবৃতি নয়, কাহিনীর মতো বয়ন করছেন এদের। ছোটো-ছোটো তুচ্ছ ঘটনার আঁচড়ে এক-একটি গল্প ফুটে উঠেছে। মাঝে-মাঝে ছুয়েকটা নতুন ঘটনার সংবাদও পাচ্ছি।

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী তখন ভাস্কর Prof. Lanteri-র অধীনে বিলেতে কাজ শিখছেন। বার্লিংটন হাউসে সেই সময়ে ওরিয়েন্টাল আর্টের একটি প্রদর্শনী হয়। দেখতে গেছেন সকলে। ঘুরে-ঘুরে ছবি ইত্যাদি দেখছেন। হঠাৎ ভাগ্নেন অবন ঠাকুরের একটি ছবির সামনে Prof. Lanteri একলা স্তব্ধের মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করায় জবাব পেলেন—

'হিরণ্ময়, এমন রঙ দেওয়ার কায়দা ওয়াটার কলারে দেখি নি। আর্টিস্ট রঙ চাপিয়ে relief তুলেছেন। অফুরন্ত রঙের বাজনা শুনছি, আর আমি তাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টকে। দেশে এমন master থাকতে আমাদের কাছে শিখতে এসেছ কেন?' (পৃ ১৫৫-১৫৬)।

রবীন্দ্রনাথ দুর্দশ শব্দের অর্থ "অদৃশ্য" বলায় প্রবোধেন্দু-নাথ তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন, একথা শুনে অবনীন্দ্রনাথ উপভোগ করেছিলেন শিষ্যের দর্শনক্ষমতা। অবনীন্দ্রনাথের এই রূপটিও হৃদ্য।

প্রবোধেন্দুনাথ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। ওকাকুরা আর টাইকোয়ানের কাছে কিছুদিন জাপানি রীতিতে চিত্রকলা শিক্ষা করেন গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ। এর ফলে গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কনরীতি পালটে যায়, একটি নতুন পথ ধরে। 'কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে এ ধরনের কিছু ঘটলো না। গগনেন্দ্রনাথকে পেয়ে বসল পদ্ধতিসমেত জাপানি ভাবধারা; কিন্তু অবনঠাকুরের ঘটলো উলটোফল। যে মানুষ ঈক্ষণ করেছেন ভারত চিত্রসংস্কৃতির ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না ইউরোপীয় চিত্রণ-পদ্ধতি;·· তিনি কেমন ক'রে অনায়াসে স্বীকার করে নেবেন জাপানিক রূপাভিযান? এবং তিনি তা পারলেন না; গ্রহণ করতে পারলেন না জাপানি চিত্র-চার্মিক রূপাস্তভেদ। সুগৃহস্থের মতো তিনি দিলেন জাপানকে সম্ভ্রান্ত অতিথির সমাদর, এবং ধিধাহীন গুণ-গ্রহনীয়তা।' (পৃ ১৬)।

অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানপদ্ধতির প্রসঙ্গে একদিনকার উক্তি উদ্ধৃত করছেন লেখক—'তোর আইডিয়াটা ভালো ঠেকছে রে। আমার বাংলার মায়েদের কী কম রূপ। ওতেই হবে,—ধার করতে যাস নি কখনো ডাচ ইস্কুলে,—বুঝেছিস আমার কথাটা। দরকার নেই আমাদের কতকগুলো থকথকে মাংসপিণ্ডের নাগা সৌন্দর্য একে। দরকার নেই আমাদের ও-ধরনের মডেলের। বুঝেছিস। এখন···দে দেখি···একটু অবার্ন ইয়েলো। ফাঁকি চলবে না বাপু, আঁকবার সময়। যখন সমস্ত খাটুনি শেষ হয়, তখন আসে···ফাঁকির কাজের বেলা।' (পৃ ১১৩)

দর্শকের অভিমত প্রকৃত রসজ্ঞের হলে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে গুরুত্ব দিতেন, চিত্রের পরিবর্তন করতেও দ্বিধান্বিত হতেন না। অবনীন্দ্রনাথ যেদিন তাঁর বিখ্যাত ছবি "আলমগীর" আঁকেন, মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক তাতে একটি ত্রুটি নির্দেশ করলে অবনীন্দ্রনাথ তা কীরকম কুশলতার সঙ্গে সংশোধন করে নিলেন, সে ঘটনার একটি কৌতূহলপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে ৫৪-৬২ পৃষ্ঠায়।

"অবনীন্দ্র-চরিতম্"-এর প্রধান সৌন্দর্য অবশ্য এর ভাষা-সৌন্দর্য আর অপরূপ বর্ণনাশৈলী। "ক্ষাদম্বরী" ও "হর্ষ-চরিতে"র অনুবাদে প্রবোধেন্দুনাথ যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। সংস্কৃত ক্লাসিকের এমন স্বচ্ছন্দ অথচ মূলানুগ অনুবাদ দুর্লভ। সেই অনুবাদশৈলী বাঙলা সাহিত্যে প্রবোধেন্দুনাথের বিশিষ্ট দান। অবনীন্দ্র চরিতম্-এ কাদম্বরীর রীতি আবার নতুনভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। ছুয়েকটি উদাহরণ দিই।

'এরপর দিনের পর দিন চিত্রণবিদ্যার চলতে থাকে পাঠ। এ সেই রকমের পাঠ—যা

মলিনতা আনে,—চরিত্রে নয়,—কাগজের শুভ্রতায়,
তীক্ষ্ণতা আনে,—স্বভাবে নয়,—তুলিকার শিথায়,
চঞ্চলতা আনে,—হৃদয়ে নয়,—বর্ণের পল্লবে,
বিহ্বলতা আনে,—মস্তিষ্কে নয়,— ভাবের বরণডালায়।'
(পৃ ৫১)

'এই ধরনের কথা বলতে বলতে অপরাহ্নের অস্তরাগের মতো Alzarnin Scarlet রঙে উঠতে লাগল গুরুদেবের মন।' (পৃ ১৬২)

'এই 'হাস্য'-রসের সরণি দিয়ে অদ্ভুত মহানের কাছে, মহা-সুন্দরের কাছে শিল্পদের পৌঁছে দেওয়াই শিল্পাচার্যদের প্রথম কৃতী। এবং আমার গুরুদেব,—ঐ নাটুকে অবন, ঐ ছেনি হাতে অবন, ঐ কাটুমকুটুম অবন, ঐ মাস্ক পোটো অবন—হাস্যবৈভবরসের যে একটি কৃতী প্রতীক ছিলেন, সে কথা আশা করি ভুভারতে মানবে। চেয়েই ছাখ না কেন একবার গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের দিকে, তাহলে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হবে তাঁর গান্ধর্ব রসিকনায়কত্বের।

'মানুষটা হলেন স্বভাবে যেন সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারে উল্টোপাল্টা।

'তাঁর আকার, তাঁর প্রকার, বাক্য, পোশাক, পরিচ্ছদ, হাত-পা-চোখ ঠোঁট সব কিছুর ভঙ্গি, অর্থাৎ তাঁর চেষ্টা—সবই কেমন যেন বিকারগ্রস্ত, এলোপাতাড়ি, হটিটটি। অথচ ঐ বিপরীতগুলির সমাবেশই যেন গুরুদেবের সমগ্রতায় সৃষ্টি করেছে এক নব্য কুহক···কুহকের সম্ভ্রম, সম্ভ্রমের শান্তি।' (পৃ. ১৬৩।)

চিত্রশিল্পী এবং সংস্কৃতসাহিত্যরসজ্ঞ প্রবোধেন্দুনাথ একটি নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টি করেছিলেন।

সাম্প্রতিক কালে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেশ কটি বই লেখা হয়েছে। এদের মধ্যে অশোকবিজয় রাহা-প্রণীত "বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ" এবং প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের "অবনীন্দ্র চরিতম্" সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য করলাম।

যুগসন্ধির স্মৃতি—নির্মল রায়চৌধুরী। লেখক সমবায় সমিতি, ৯২ই কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০৭। কুড়ি টাকা।

শ্রীনির্মল রায়চৌধুরী একটি রাজনৈতিক দলের (আর. এস. পি) সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত। বর্তমান গ্রন্থে লেখক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছেন। 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের একটি ভগ্নাংশের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।' নেপথ্যবর্তী সেসব মানুষের কথা বলেছেন শ্রীরায়চৌধুরী।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সাদামাটা। রঙ চড়াবার চেষ্টা করেন নি, নাটকীয়তাও নেই। পড়তে মন্দলাগে না। ছুয়েকস্থানে সনতারিখে কিছু বিচ্যুতি থাকতে পারে। লেখকের বর্ণনা অবশ্যই ইতিহাস-সম্মত অবজেকটিভ নয়। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গির আলোকে তিনি ঘটনাবলীর বিচার করেছেন। সে বিচার কালের কষ্টিপাথরে কতটা টিঁকবে এখনই বলা সম্ভব নয়।

অবনীন্দ্র-চরিতম্—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রথম "রূপা" সংস্করণ সেপটেম্বর ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ১৭০। ২৫ টাকা।

শিক্ষা ও সমাজ—একটি তৃতীয় বিকল্প

মহাশ্বেতা চৌধুরী

দেশবিদেশের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা এবং অন্যান্য সমস্যা যে-কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ভাবায়। তার ওপর সেই ব্যক্তি যদি ভারতের মাটিতে জন্মে পাশ্চাত্ত্য জগতের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং সেই সুদূর জগতের disengaged দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমাজের সমীক্ষা করেন, তাহলে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হবেই। বিকল্প পন্থার সন্ধান দিতে আকুলতাও দেখা দেবে। "শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও দেশকাল" গ্রন্থটিতে লেখিকা মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে নিজেই জানিয়েছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি কার্যোপলক্ষে দেশছাড়া, অস্ট্রেলিয়ায়বাসী। শিক্ষকতা তাঁর পেশা। প্রবাসী হলেও দেশের সমস্যা—বিশেষ করে সমাজউপযোগী জনশিক্ষার অভাব—তাঁকে নানা দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। বর্তমান গ্রন্থটি সেই চিন্তাভাবনার ফল।

"শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও দেশকাল" আসলে বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন। বলা হয়েছে, কয়েকটি প্রবন্ধ "দেশ" ও অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কালনির্দেশ না থাকায় বোঝা গেল না সেগুলি কতদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরনের প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করে স্থান-কালের ওপর। নইলে মূল্যায়ন করা কঠিন, এবং তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

সঙ্কলন বলে গ্রন্থটির সামগ্রিক আলোচনা করা কঠিন, আবার প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বক্তব্য আর যুক্তি এত স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নয় যে আলাদা-আলাদা করে বিচার করলে আমরা লাভবান হব। বস্তুত প্রবন্ধগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ওভার-ল্যাপিং। আমি তাই (বহুবার পড়েও নিশ্চিত না হয়ে) লেখিকার মূল্য বক্তব্য কী কী তা নির্দেশ করার চেষ্টা করে, তিনি তা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (বা করতে পেরেছেন কিনা) তার আলোচনা করছি।

প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য আলোচনা উঠলেও প্রকৃত শিক্ষা কী এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে স্বাধীনতা-উত্তর কালে কেন এখনও বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত আর অনুন্নত—এইসব প্রশ্নই বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। গণশিক্ষার (জনশিক্ষা) মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের সমাজে একটি 'সমমনোভূমি প্রতিষ্ঠা'ই সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা আর জ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করবে, যে জ্ঞান উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান না হলেও মানুষকে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারবে—এটিই প্রধান সিদ্ধান্ত। তবে এর একটি অনুসিদ্ধান্ত আছে। ভারতের দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবনের মান উন্নত করার উদ্বেগের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনের ভোগবিলাসী জীবনবোধের প্রতি অনীহা এবং ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আদর্শ শিক্ষা একদিকে স্বয়ংনির্ভর হতে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে মানসিক ক্রমোন্নতিকে ভোগবিমুখী, পরার্থপরতার দিকে নিয়ে যাবে। অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই লেখিকার আন্তরিক এবং হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি আর বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে সমস্যা আর সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন তার বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। শিক্ষা নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে বক্তব্য এবং প্রস্তাব থাকা উচিত। ভারতীয় অদৃষ্টবাদের পুনরুত্থান দেখি আমাদের সমাজের স্তরে-স্তরে, সব অবস্থাকেই সবাই 'কিছু করা যাবে না' বলে ঘটনাচক্র যেদিকে যায় সেইমতই চলে। যত অন্যায় বা অসুবিধাজনক হোক স্থিতাবস্থাকে মেনে নেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রত্যেক শিক্ষকেরই যে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকা উচিত, শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি সে কথা মনে করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁর চেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

প্রবন্ধগুলি ক্রমানুসারে নিম্নরূপ; 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে', 'একটি বিকল্পব্যবস্থা', 'ধর্ম বনাম সংহতি', 'জনশিক্ষায় বিষয়-নির্বাচনের গুরুত্ব', 'জনশিক্ষায় ধর্মশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা', 'সমীক্ষা ও প্রস্তুতি', 'শিক্ষানীতি লোকসংগ্রহ ও সফল সংস্কার', 'স্বতবিরোধ', 'প্রতিশ্রুতি ও অন্বেষণ'।

বিভিন্ন প্রবন্ধে আধুনিক সমাজে সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয়কে লক্ষ করে গণশিক্ষাকে একটি আদর্শরূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গণশিক্ষা (বা আদর্শ শিক্ষা) ব্যক্তিকে স্বনির্ভর হওয়ার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেই শুধু সচেতন করে তুলবে তা নয়, তাকে সমাজের উপযোগী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সদস্যও করে তুলবে। আর তার জন্য প্রয়োজন নীতিশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ধর্মবোধের উন্মেষ ইত্যাদি। 'গণশিক্ষা যদি ধর্মবোধ অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক নীতি ও চরিত্রগঠন বিষয়ক শিক্ষা-বিযুক্ত হয়, স্বাভাবিকভাবেই তা একদেশদর্শী, অসম্পূর্ণ, সমগ্র সমাজবোধ ও সংহতি সংস্কৃতি প্রসারে অসমর্থ। কেননা ধর্মবোধ মানবমনের একটি গভীর চেতনা।' (পৃ ১১)

আগেই বলেছি, প্রবন্ধগুলির বক্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা নয়, আবার বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেকটি একটি বৃহত্তর সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার খণ্ড-খণ্ড অংশও নয়। অবশ্য লেখিকা নিজেই প্রথমে স্বীকার করেছেন যে 'কোন প্রবন্ধই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে লেখা নয়।' তবে এগুলি 'চিন্তার খোরাক যোগাবে বলে তিনি আশা করেন। আধুনিক সমাজ-জীবনের যেসব দিক আর সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেগুলি বহু-কথিত এবং বহু-আলোচিত আর বিতর্কিত নয়। উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য স্তরের শিক্ষায় বিষয়শিক্ষার ওপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, সামগ্রিক জীবনবোধের উন্মেষের ওপর তত জোর দেওয়া হয় না বলে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের মতো নানা ভাষা-সংস্কৃতির বিচিত্র জগাখিচুড়ি সমাজে সংহতি, ঐক্য স্থাপিত হবে যদি বিষয়শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম সম্বন্ধেও মানুষ সচেতন হয়। ঠিক কথা। কিন্তু ফরমাল আর ইনফরমাল শিক্ষার পার্থক্য কি তাই নয়? বিষয়শিক্ষা অর্থাৎ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান—এসব শিক্ষা মানুষকে আলোকপ্রাপ্ত করে। তা ছাড়া, শৈশব থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে (ধরুন ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্যের মাধ্যমে) অন্য সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে তো চেতনা জন্মায়! ক্যাথলিক বা অন্যান্য ধর্মীয় স্কুলের মতো কি "নীতিশিক্ষার" পাঁচনবড়ি গলাধঃকরণ করালেই "আদর্শ সামাজিক জীব" তৈরি হবে? আমি লেখিকার উদ্বেগ আর আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁর শিক্ষানীতিও যুক্তি-সঙ্গত। কেউই তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন না যে শিক্ষার লক্ষ্য সর্বাত্মক উন্নতি আর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল নয়। সমাজের মধ্যে (আমাদের দেশের কথাই বেশিবার উঠেছে) ধনী দরিদ্রের তফাত, সুবিধাভোগী আর বঞ্চিতের তফাত দিন-দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এই বৈষম্যের অবসান ঘটতে পারে যদি মানুষ প্রকৃত অর্থে 'মহাজ্ঞানী মহাজন'কৃত ন্যায়সম্মত পথে বিচরণ করে। ন্যায়সম্মত মানে লেখিকার মতে 'সমগ্র ভারত সমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য'। আবার একই রকম—এখানেও দ্বিমতও নেই, নতুনত্বও নেই। ৪২ পৃষ্ঠায় আমরা অবশ্য শিক্ষণীয় নীতি বলে যা দেখছি, এন. সি. ঈ. আর. টি. নানাভাবে শিক্ষানীতিতে তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছে। তবুও আবার এ প্রস্তাবের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাদের দেশের স্কুলকলেজের শিক্ষার ভেতর-ফাঁপা অসারসর্বস্বতা অনুভব করলে যে-কোনো শিক্ষাবিদেরই উচিত অনুরূপ প্রস্তাবের মর্ম উপলব্ধি করা। ওয়র্ক এডুকেশন, লীডারশিপ প্রোগ্রাম, সোশ্যাল স্টাডিজ প্রোজেক্ট বলে নানারকম কার্যক্রম আছে, নামমাত্র ফীলডওয়র্ক এবং হাতে-কলমে কাজও হয়, তবু মাটির শিকড়ের সঙ্গে শিক্ষার যোগ তাতে ঘটে না। তা ছাড়া, স্কুলকলেজের শিক্ষা এত বেশি নগরভিত্তিক আর ক্লাসরুম-নির্ভর যে ভারত গ্রামপ্রধান হলেও এখনও শিক্ষিত ব্যক্তি মানেই বড়ো শহরের লোক আর শিক্ষা মানেই স্কুলকলেজের লেকচারে আবদ্ধ পচা-ডোবা, বাইরের ঢেউ তাতে পৌছয় না। তাই গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা, মধ্যশিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা বাড়লেও প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে নি। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

'একটি বিকল্প ব্যবস্থা' প্রবন্ধে লেখিকার বক্তব্য আর প্রস্তাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। একটি 'সমমনোভূমি'র লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তিনি সর্বভারতীয় স্তরে একই রকম কার্য-সূচী, মান চালু করার পক্ষপাতী। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখলে বিভিন্ন বিষয়ে ভাববিনিময় হতে পারে। একদিকে প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ (যা গ্রামের মানুষ পায় না), অন্যদিকে হাতে-কলমে শিক্ষণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ (যা শহরের মানুষের হয় না), এবং শিক্ষার বহুমুখী অভিযানে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটবে। অন্যত্র তিনি বেকারসমস্যা সমাধানের এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পূর্ণ সময়ের জন্য না হলেও কয়েক ঘণ্টার (যার বহুল প্রচলন পাশ্চাত্ত্য জগতে আছে) জন্য কর্মসংস্থানের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, বেশির ভাগ পাশ্চাত্ত্য দেশে লোকসংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম (বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায়!)। আর অল্প বেতনে যদি পূর্ণ সময়ের কর্মচারী পাওয়া যায়, মালিক তাহলে তাঁর প্রস্তাবমত দু সেট কর্মী নিয়োগ কেনই বা করবেন? তা ছাড়া, কায়িক পরিশ্রম এখনও আমাদের মতো দরিদ্রপ্রধান বিপুলজনসংখ্যাবহুল দেশে মর্যাদাসম্পন্ন হয় নি। শিক্ষিত এবং/অথবা ধনী ব্যক্তি যে কায়িকপরিশ্রমবিমুখী, লেখিকার এই উক্তির সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু ইতিহাসেও কি তাই দেখি না—পাশ্চাত্ত্য জগতে যখন সস্তায় শ্রম কেনা যেত তখন দাসদাসী

শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও দেশকাল—মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলিকাতা-৭০০০৫৯।

আর দরিদ্র ব্যক্তিরাই কায়িক পরিশ্রম করত? ধনী/অভিজাতরা বিলাসবহুল উচ্চমার্গের সাধনায় দিন কাটাতেন। খেলা, শিকার, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদিই ছিল অভিজাত-শ্রেণীর আগ্রহের এলাকা। কিছুটা সামাজিক পরিবর্তন হলেও ভারতে এখনও দরিদ্র অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি, ফলে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা যথেষ্ট ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

উচ্চস্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, এমন সংখ্যাধিক্যের জন্য য বৃত্তিমূলক বকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন, লেখিকার এ প্রস্তাবও যুক্তিসঙ্গত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সেখানে অবান্তর। দশ-বারো বছরের সাধারণ শিক্ষার ভিত যদি শক্ত হয় তাহলেই বহুক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার যোগ্যতা মেলে। পৃথিবীর সর্বত্র অফিস, ব্যাঙ্ক, পুলিশ, মিলিটারি ইত্যাদি নানারকম পেশায় বি. এ, এম. এ., লোকেরা যায় না। উচ্চশিক্ষায় যায় মুষ্টিমেয় মেধা- ও প্রতিভাসম্পন্ন কজন, যাদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে নতুন অবদানের সম্ভাবনা রয়েছে। হায়! এ কথা কি কারো অজানা যে বাস্তবমুখী ব্যবহারিক শিক্ষাই বেশির ভাগ মানুষের পাওয়া উচিত যাতে তারা স্বনির্ভর আর সমাজের উপযোগী হয়? বিকল্প ব্যবস্থার নানা সম্ভাব্য দিক দেখানোর জন্য ৬০ পৃষ্ঠায় লেখিকা একটি 'অপটু' (তাঁর বিনয় প্রশংসনীয়) ছক দিয়েছেন। ছকটি মোটেই 'অপটু' নয়, যথেষ্ট সযত্নে করা। বহুমুখী প্রশিক্ষণ—যেমন খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, প্যারামেডিক্যাল, টেকনিকাল থেকে প্রিনটিঙ, টেলারিঙ কারপেনট্রি ইত্যাদি নানারকম ট্রেডের উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের পর এই-সব বিশেষ দিকে প্রশিক্ষণ সাধারণ শিক্ষার পর দ্রুত স্বয়ংনির্ভর হতে শেখাবে আর সমাজের চাহিদাও মেটাবে।

এই প্রবন্ধটি কতদিন আগে লেখা জানি না, কিন্তু ভারত শম্বুকগতিতে চললেও এই ধরনের প্রশিক্ষণ এখানে বহুদিনই প্রচলিত আছে এবং ক্রমে-ক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। লেখিকা বিদেশে থাকেন বলে আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির অবস্থা জানেন কিনা জানি না, তবে বিকল্প শিক্ষা আরো বহুলভাবে গৃহীত হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিড় একটু কমত, তাতে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ হয়তো একটু উন্নত হতে পারত। তবে আবার বলছি—ভারতের জনসংখ্যা, এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার মিথ্যে সম্পর্ক এখনও এত বড়ো সমস্যা যে বিকল্পশিক্ষায় অনেকে চলে গেলেও উচ্চশিক্ষার সমস্যা থেকে যায়। তার ওপর আছে সবকিছুর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপ। তা ছাড়া, পাশ্চাত্ত্য জগতে নিপুণ শ্রমিক বা কারিগর যত সচ্ছলতা লাভ করে এখানে তা সম্ভব নয়। কাঠের মিস্ত্রি, চাষি বা কলের মিস্ত্রির বিদেশে জীবনযাত্রার যা মান, এখানে তার সমরূপ ব্যক্তি কোনোরকমে হয়তো জীবনধারণ করতে পারে। লনডনে আমাদের কলের মিস্ত্রির গাড়ি বাড়িওলার গাড়ির চেয়ে অনেক বড়ো আর দামি ছিল, তাতে করে এসেই সে কল বা পাইপ সারিয়ে যাচ্ছে বাড়ি-বাড়ি। আর অ্যামেরিকার মান তো আরও উন্নত। অন্যান্য অনেক জটিল আর্থ-রাজনৈতিক কারণে বিকল্প ব্যবস্থা এখানে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। প্রতিশ্রুত স্বয়ংনির্ভরতাও ন্যূনতম মাত্রায় দিতে পারে। তবে আশার কথা যে, মানসিকতার বদল হচ্ছে। ইনজিনিয়ারিঙ-ডাকতারির সঙ্গে-সঙ্গে হোটেল চালনা, ফারমাসি বা মুরগি চাষেও এখন অনেক শিক্ষিত পরিবারের সন্তানেরা যোগ দিচ্ছে। শুভ ইঙ্গিত সন্দেহ নেই।

তবে প্রাদেশিকতাবোধের মুক্তি ঘটানো, ধর্ম আর সংহতির পথে ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ আর সমাজবোধের উন্মেষ ঘটানোর যে কার্যক্রমের আভাস বিভিন্ন প্রবন্ধে রয়েছে, তা কতটা কার্যকর হবে বলা কঠিন। যে গুণাবলী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা যে-কোনো জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বলে লেখিকা বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সে গুণগুলি যে অত্যন্ত মূল্যবান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ধর্মবোধের উন্মেষ বা নৈতিকতার শিক্ষা কিভাবে কার্যকর হবে তার কোনো সরল ফরমুলা আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তিকে সমাজ সম্বন্ধে, প্রতিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই 'প্রকৃত শিক্ষা'—এ বিষয়ে কারো সন্দেহও নেই, নেই বিতর্কও। বহুকথিত হলেও কেন আমাদের দেশে তার অভাব, কেন মানুষ পরিবেশ সম্বন্ধে এমন উদাসীন, স্বার্থপর হতে পারে—সেটাই লেখিকাকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই অবাক করেছে। পাশ্চাত্ত্য জগতের যে সুযোগসুবিধাগুলি মানুষ ন্যূনতম প্রাপ্য বলে ধরে নেয়, তাই যে এদেশে বিরল ঘটনা, এ সত্য আবিষ্কার করে বিদেশীর কেন, বিদেশ থেকে আসা স্বদেশজাত ব্যক্তিরও ধাক্কা লাগে। হাসপাতালে ওষুধপত্র নেই, চিকিৎসাও তেমন, রাস্তাঘাটে আবর্জনার স্তূপ, ভাঙা-চোরা সরু-সরু রাস্তায় অনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের বিশৃঙ্খলা, ফুটপাথ হকারদের কবজায়, ফলে গাড়ির রাস্তায় (ফ্লাই-ওভারে পর্যন্ত!) পথচারীর ভিড়—স্কুলকলেজ অফিস নোংরা,

গোলমাল আর বিশৃঙ্খলার রাজত্ব—এসব পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই—এ মনোভাব বিপজ্জনক এক উদাসীনতার সৃষ্টি করেছে। বাইরের চোখে যে এ দৃশ্য কী ভয়ঙ্কর লাগে লেখিকার আক্ষেপে তা প্রকাশ পেয়েছে। হয়তো তা সবার চোখ খুলতে সাহায্য করবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সব ভারতবাসীর জন্য একই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হলে সবরকম বৈষম্য, অন্যায় দূর হবে, সমাজসচেতনতা বাড়বে। এইখানে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনের বাস্তবমুখী শিক্ষা যে ব্যক্তিকে স্বয়ংনির্ভর হতে শেখাচ্ছে তা যেমন অনুসরণযোগ্য, সে জগতের জীবনবোধ তেমন নয়। একই সঙ্গে লেখিকা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি এবং যারা 'শিক্ষিত হয়েই বিদেশে ছোটে' তাদের ধিক্কার দিচ্ছেন। তাঁর বর্ণিত রামরাজ্য এমন হবে যে 'একদিকে অধিকারের চেতনা, অপরদিকে কর্তব্যের প্রেরণা একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ ও উদ্দেশ্যের সমতা সমাজে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির পথ সুগম করবে' (পৃ ৯৯)।

ধর্মভাব ব্যক্তির চেতনার একটি অংশ এবং শিক্ষাক্রমে তার উন্মেষ ঘটানো মঙ্গলকর। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুনাফা-প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বর্জন করা উচিত। 'আত্মকেন্দ্রিক', 'ধনলুব্ধ', 'অভিসন্ধি-পরায়ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই শ্রেষ্ঠ ও জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ এই মতেই বিশ্বাস স্থাপন করে প্রাচ্যের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলব' (পৃ ১২১)। সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাই হল এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঁচার বিশল্য-করণী। লেখিকার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সহানুভূতিহীন পাঠক ব্যঙ্গ করতে পারেন যে ধনতান্ত্রিক দেশের প্রাচুর্যময় জীবন-যাত্রা থেকে প্রাচ্যের অন্তর্মুখী আদর্শের স্বপ্নসৌধ গড়ে তোলা সহজ—ভারতের দরিদ্র এবং জটিল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিপ্রধান প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং সমাজতান্ত্রিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যপন্থী তৃতীয় বিকল্প এবং আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সমস্যাগুলি অত সরল নয়। দিনে-দিনে জটিলতর সমস্যা ভিন্ন-ভিন্ন দিকে রূপ নিচ্ছে। তার ওপর যদি গত কয়েক বছরের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও প্রতিবেশী দেশগুলি সংক্রান্ত সমস্যার কথা চিন্তা করা যায় তাহলে মনে হয় idealized কোনো শিক্ষানীতিই পূর্ণ সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। তবু তাঁর সদর্থক মনোভাব ও প্রস্তাবিত কার্যসূচীর জন্য ধন্যবাদ জানাই। বেশির ভাগ শিক্ষকের নেতিবাচক, হতাশ এবং নির্বিকার মনোভাবের বিপরীতে তাঁর চিন্তার ফসল প্রবন্ধগুলি বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম।

সমাজ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, শিক্ষা, মানুষ গড়ার নীতি—এসব নিয়ে যা বলা হয়েছে প্রায় সবই এমপিরিকাল, তথ্যগত বা তত্ত্বগত ভুল নেই, তেমনি অভিনবত্ব নেই। বরং নানাভাবে পুনরাবৃত্তির জন্য আন্তরিকতা সত্ত্বেও বক্তব্যের ধার কমে গেছে। বিশেষ করে শেষ দুটি প্রবন্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কিছু মন্তব্যপূর্ণ দিনপঞ্জীর মতো। বিদেশবাসী ভারতীয়রা বহুবার স্বাভাবিকভাবেই, নতুন দেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনায় প্রথমে চমৎকৃত ও পরে ঘোর কেটে গেলে কিছুটা হতাশ হয়, দেশের কথা মনে করে উদাস হয়। কেউ-কেউ আবার চাক্যচিক্যময় জীবনে খুশিই থাকে, বিশেষ করে এদেশে যাদের জীবনযাত্রার মান ভালো ছিল না তারা সহজেই মানিয়ে নেয়, দেশের দুঃখকষ্টের কথা মনে করে। অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল আর অতি তরুণ নন, এমন ব্যক্তিরা হয়তো তলিয়ে ভাবেন। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায় সেরকম সংবেদনশীল একজন শিক্ষক। তাঁর চিন্তা আর বক্তব্য সত্য-মুখী, বাস্তবধর্মী কিন্তু নতুন কিছু পেলাম না। ভাষা আর বাক্যের গঠন আড়ষ্ট। কখনো-কখনো অনুবাদ মনে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বাক্যের আকার নিয়মমাফিক আর স্পষ্ট নয়। বানান এবং শব্দ ব্যবহারেও কিছু-কিছু ভুল আছে। স্থান-অভাবে বেশি দেওয়া গেল না, একটি করে দৃষ্টান্ত—১৮৬ পৃষ্ঠায় 'বাঞ্ছনীয়' 'বাঞ্জনীয়' হয়েছে, ১৭৭ পৃষ্ঠায় 'নিদান' কথাটির প্রয়োগও সঠিক নয়। তবু লেখিকার আন্তরিক উদ্বেগ ও প্রস্তাবগুলি সব শিক্ষক ও চিন্তাবিদদের কাছেই আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়।

গৌরী আইয়ুবের গল্পসংকলন

কামাল হোসেন

তিনি জনপ্রিয় অধ্যাপিকা। তিনি খ্যাতনামা সমাজসেবিকা। কলকাতার মুসলমান বস্তিতে মেয়েদের কাছে গিয়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বোঝান। 'জাতীয় সংহতি'র ওপর ব্যাপক আলোচনার সূচনা করে একই মঞ্চে তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বিতর্কিত শিখ বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে মার্কসবাদী শিক্ষাবিদকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণ ছেলেরা যাতে ঠিকমতো তৈরি হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি সরাসরি সাহায্যে এগিয়ে আসেন। জরুরি অবস্থার সময় যে-কজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী স্বাধীন মনন আর আত্মা নিয়ে বাহুবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভীত হন নি, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে এসপ্লানেড ঈস্টে অসুস্থ হাঁটু নিয়ে লাঠি হাতে উপস্থিত থাকেন তিনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার নির্বোধ, নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে বিপন্ন মানবতার পাশে শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে একত্রিত করতে সবার আগে তিনি এগিয়ে আসেন।

অথচ এত কিছু কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে কোথাও নেই আত্মপ্রচারের উৎকট উৎসাহ কিংবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী-সুলভ উন্নাসিকতা। বস্তুত মনীষী দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী হিসেবে তাঁর যত না পরিচিতি, নিজস্ব চারিত্রিক ঋজুতায় একালের বাঙালি সমাজজীবনে কিংবদন্তির মতো এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে আমরা চিনি। তিনি গৌরী আইয়ুব।

হয়তো এত কিছু দায়িত্ব পালনের নিয়মিত ব্যস্ততার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তাঁর লেখক-অস্তিত্ব। অনেকেরই মনে থাকে না, কী অসামান্য সাবলীল গদ্য প্রাণ পায় তাঁর কলমে। আসলে খুব কম লেখেন তিনি। কিন্তু যখন লেখেন, বিষয় আর উপস্থাপনার মৌলিকত্বে পাঠক হিসেবে রীতি-মতো অবাক হয়ে যেতে হয়। অভিযোগ করতে ইচ্ছে হয়, কেন তিনি নিয়মিত লেখেন না?

তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ—গৌরী আইয়ুব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। বইমেলা, ১৯৮৬। ১৯১ পৃষ্ঠা। কুড়ি টাকা।

আমাদের সকলের এতদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ করে দে'জ পাবলিশিং একটা বিরাট কাজ করেছেন। গৌরী আইয়ুবের পনেরোটি গল্পের একটি সংকলন তাঁরা প্রকাশ করেছেন। পাঠক হিসেবে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ এই প্রতিষ্ঠানের কাছে।

তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁর গল্পসংকলনের নাম দিয়েছেন "তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ"। তুচ্ছ কিন্তু তুচ্ছ নয়। মানবসংসারের বিচিত্র গলিপথের গোলকধাঁধা থেকে যেসব টুকরো-টুকরো মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে তিনি গল্প লিখেছেন, সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের এই খরার মরশুমে সত্যি-সত্যিই সেগুলি এক অসামান্য রচনা।

বস্তুত এই গল্পগুলি যেন বাঙালি জীবনের প্রতিদিনের বেঁচে-থাকার টানাপোড়েনের ক্রশ-সেকশন। বাঙালি মানে সামগ্রিক হিন্দু মুসলমানের অস্তিত্ব-মাখা জনজীবন। বহুতল বাড়ির উচ্চবিত্ত থেকে বস্তির খুপরি পর্যন্ত। সমাজ আর সংসারের বাহির-মহল থেকে কোন্ রহস্যময় অন্দরমহল পর্যন্ত না তিনি ঘুরে এসেছেন!

"প্রত্যর্পিত" গল্পের মা শোভার সমস্যা কি কম? অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে কমলকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করলেন শোভা। বিয়ের পর সেই ছেলে যখন মানসিক দিক দিয়ে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, সে দূরত্বের বেদনা আর নিঃসঙ্গতার অনুভব অবশ্যই সর্বজনীন। গল্পের মোড় ঘুরে যায় যখন ছেলেটি হঠাৎ মারা যায়। এবং বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই পুত্রবধূ পুনর্বিবাহ করার পর মা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, পুত্রের ওপর পূর্ণ অধিকার আবার তিনি অর্জন করেছেন। এখন থেকে পুত্রের জন্য শোক করবেন তিনি একা। পুত্রের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেবেন কেবলমাত্র তিনিই, পুত্রবধূ আর সেখানে ভাগীদার হতে আসবে না। মাতা-পুত্রের নিগূঢ় সম্পর্কের বিশ্লেষণে গ্রীক ট্রাজেডির ক্ল্যাসিকাল পটভূমিকায় আমাদের পৌঁছে দেন লেখিকা।

"অসমাপ্ত" গল্পের কল্যাণীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল আর্টিস্ট অশোকের সঙ্গে। সংসার-প্রতিপালনের অক্ষমতা জানিয়ে অশোক সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। জ্যেষ্ঠের প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাব অনুজ অসিত স্বীকার করেছিল। ছ বছর পর অশোক একদিন তাদের সংসারে এল। শিল্পী অশোকের ছবি আঁকার তন্ময়তা ধীরে-ধীরে গ্রাস করতে থাকে কল্যাণীর সমস্ত সত্তা। প্রতিভাবান শিল্পীর সৃষ্টির ব্যাপকতায় কিভাবে যেন কল্যাণী সম্মোহিত হয়ে যায়। একদিন সাহস সঞ্চয় করে

বলেও ফেলে, 'সংসার বড়ো একঘেয়ে লাগে, আরও কিছু করতে মন চায়! আমাকে যদি রোজ একটু আঁকতে শেখান—এক কালে আমার একটু হাত ছিল—সবাই বলত…।' কল্যাণীর কথা শুনে এমন অকপট বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল অশোক যে এক পলকে কল্যাণী নিভে গেল। সঙ্গ-কামনার নির্লজ্জ প্রার্থনাটা নিজের চোখেও স্পষ্ট হয়ে অতর্কিতে তার মাথায় এক ঘা দিয়ে বিভ্রান্ত করে দিল কল্যাণীকে। বস্তুত, অনেক যন্ত্রণার পথ বেয়ে সাময়িক মোহকে অতিক্রম করে বাস্তবের অসিতের কাছেই তাকে ফিরে যেতে হল।

"অতুলনীয়া" গল্পের সুতপা কেমন মেয়ে? মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'সাইকোপ্যাথ' বললে কি লেখিকা দুঃখ পাবেন? অপূর্ব সুন্দরী এই কন্যার জীবনসৈকতে প্রেম আসে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। আসে কিন্তু কোনো চিহ্ন রেখে যায় না তার জীবনে। শরীরী ভালোবাসার অন্তঃস্তল ছুঁয়ে কোনো মনের মানুষের সন্ধান করার মতো কোনো চিরকালের আকুতি বিভ্রান্ত করে না তাকে। 'কোথায় পাবো তারে'—এমন কোনো বাউল গানের জন্যও একতারা বাজাতে রাজি নয় এই মেয়ে। স্বামীর কর্মস্থল থেকে এক জার্মান যুবক ক্লাউসকে কলকাতায় নিয়ে এসে কয়েকদিন আনন্দ-ফুর্তিতে সময় কাটানোর পর যেভাবে খুব সহজ ভঙ্গিতে স্বামীকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সে প্রকাশ করে, তার স্মৃতিহীন, ভার-হীন মানসিকতা আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে নিশ্চিত ধাক্কা দেয়। সামাজিক সংস্কার আর নীতির প্রতি তার এই নির্লিপ্ত অবহেলা প্রজাপতির নির্বোধ নীতিহীনতার সঙ্গেই হয়তো তুলনীয়।

"অঘটন" গল্পের বিন্যাস আর বর্ণনাভঙ্গি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিকে হয়তো মনে করিয়ে দেয়। যদিও সতর্কভাবে পড়লে বেশ বোঝা যায়, লেখিকার বক্তব্য অনেকখানিই ভিন্ন। খুব সচেতনভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পটির ফর্মকে গ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর গল্পের নায়িকা পদ্মামাসি নায়কের কিশোর বয়সের অবসেশন। বিলেত-ফেরত নায়কের হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল কৈশোরের যন্ত্রণাবিদ্ধ সবুজ প্রান্তরে আর-একবার পিছু ফিরে হেঁটে আসতে। দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত বিবাহিতা পদ্মামাসিকে দেখে ফিরে আসার মধ্যে যে স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ পরাগরেণুর মতো পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, সে যন্ত্রণার ভাগীদার আমরা সবাই।

"দায়" গল্পের রানী বিধবা হয়েছেন অল্প বয়েসে। বয়স্ক বিপত্নীক ভাশুর আর তাঁর ছেলে সুবিমলের সেবা আর দেখাশুনোর মধ্যেই কেটে যাচ্ছে নিঃসন্তান রানীর জীবন। সমবয়েসী সুবিমল বন্ধুর মতো। অবচেতনায় কখনো হয়তো বাঁশি বাজে। মনের কাছাকাছি এসেও যেন কোথায় কাঁটা বেঁধে। স্পষ্টভাবে পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে পারেন না দুজনে। মনের অগোচরে সোনালি কুসুমের কুঁড়ি ফোটার মুহূর্তে রানী বাস্তবে ফিরে আসেন সুবিমলের বোনের পাঠানো এক বিবাহপ্রস্তাবে। এবং সে প্রস্তাবে সুবিমল সহজভাবে রাজি হয়ে যাওয়ায় ঠিকমতো হিসেব মেলাতে পারেন না রানী।

"আমি চিনি গো চিনি" গল্পের নায়িকা বিদেশিনী ইজাবেলের সঙ্গে শচীন বসুর প্রথম দেখা হয় কোনো এক সেপটেমবরের সন্ধ্যায়। বিয়ে হয় দু মাস পর নভেমবরের শেষাশেষি। বিয়ের খাতায় ইজাবেলের বয়স ছিল একুশ আর শচীন বসুর উনষাট। ইজাবেল শাড়ি পরতেন, এদেশকে ভালোও বাসতেন। তাঁর চোখে স্বামী ছিলেন বিশাল পণ্ডিত আর শিল্পী-সাধক। শচীনের যৌন অসামর্থ্য তাঁদের শরীরের সম্পর্ককে এক নিদারুণ বঞ্চনার মধ্যে ঠেলে দিলেও ইজাবেল ভান করতেন তিনিও আত্মসংযমে বিশ্বাসী। শচীন যখন তাঁকে 'ফ্রিজিড' বলে করুণা করতেন, বুকে অসম্ভব যন্ত্রণা হলেও স্বামীকে আঘাত দেবার মতো কিছুই বলতে পারতেন না সেই বিদেশিনী।

"বিচিত্র" গল্পের পটভূমি এক ট্রেনযাত্রা। আকস্মিক-ভাবে ট্রেনের কামরায় দেখা হল দুই পুরোনো বান্ধবীর। টুকরো-টুকরো সংলাপ। কেউ কারুর কাছে খোলামেলা হতে পারছিল না। দুজনকেই হয়তো বিব্রত করছিল সেই অনুপস্থিত পুরুষটি, যাকে তারা দুজনেই ভালোবেসেছিল; ঘনিষ্ঠ হয়েছিল এক সময়। দমবন্ধকরা রুদ্ধশ্বাস নাটকের মতো গল্পটি আমাদের পৌঁছে দেয় জীবনের এমন এক কিনারায়, যেখানে সত্যিই আর পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখার অবকাশ মেলে না।

"আত্মগত" গল্পের তিপ্পান্ন বছরের রথীন্দ্র করোনারি থ্রমবসিসের প্রথম ধাক্কাটি খেয়েছেন। ফলে ঘরে-বাইরে সাবধানতার পালা চলছে। অসুখের বিষণ্ণ ছায়ায় একজন মাঝবয়েসী মানুষ নিঃসঙ্গভাবে কখন যেন নিজের অস্তিত্বের শেকড় ফালা-ফালা করে খুঁজে দেখেন। হঠাৎ পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে হাতে এসে যায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে লেখা এক তরুণী জিনার চিঠির ধূসর সত্তা। কী যেন পাই নি,

পেতে পারতাম, যন্ত্রণায় হাহাকার করে ওঠে বর্ণীন্দ্রের মন। এরকম বেঁচে থাকার অবান্তর আয়োজন আর-একবার টের পেয়ে যান তিনি।

"বর" গল্পে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে পণপ্রথার কুৎসিত প্রকাশটিকে নগ্নভাবে দেখিয়েছেন লেখিকা। বিষয়বস্তুর স্পষ্টতায় একটি প্রচারধর্মী গল্প হওয়ার সুযোগ থাকলেও খুব মুনশিয়ানার সঙ্গে সামাল দিয়েছেন তিনি।

এ সংকলনের সবথেকে আকর্ষণীয় গল্প নিঃসন্দেহে "বেজোড়"। সাধারণ মাঝবয়েসী মধ্যবিত্ত বিধবার মতো রান্নাবান্না সমেত সমস্ত সংসারটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাচ্ছেন সতী। একঘেয়ে। মূল্যহীন। রুটিনবাঁধা। বউমা নীলিমার দ্বিতীয়বার সন্তান-প্রসবের সময় বাড়িতে এলেন হার্টের রুগী বিশত্তর বেয়াই রমেশ। প্রথম দিকে কিছুটা নিরুৎসাহ থাকলেও কিভাবে যেন পরস্পরের মনের কাছাকাছি পৌঁছে যান প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। নীলিমার স্বার্থপর আচরণ একালের অধিকাংশ তরুণী বধূমাতাদের নিষ্ঠুরতাকে নির্ভুলভাবে আইডেনটিফাই করে। খুব সহজ ভঙ্গিতে এই স্বার্থপর সময়ের অনাবশ্যক শূন্যতার গভীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের ছুঁড়ে দেন লেখিকা।

ধনী মিসুমাসির অন্তের জিনিস আত্মসাৎ করার অভ্যেসকে নিছক ক্লেপটোম্যানিয়া বলে সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না "নীচ" গল্পে। ব্যক্তিত্বের কাঠামোয় যে লোভ আর অপরাধী মানসিকতা উপাদান হিসেবে কাজ করে, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের নিরিখে তা যথেষ্ট কৌতূহল বাড়ায়।

এক ব্যর্থ সঙ্গীতশাস্ত্রক "তর্কাতীত" গল্পের নায়ক। সবদিক দিয়ে পরাজিত, ব্যক্তিত্বহীন মানুষটির মূল্য তার স্ত্রীর কাছে দিন-দিন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যায়। সেই ভয়ঙ্কর সম্পর্কহীনতার বেদনাময় চিত্র মানবসম্পর্কের অন্তরত অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তোলে।

এ আলোচনার সবশেষে উল্লেখ করব দুটি গল্পের নাম: "ত্রিযামা", "চিরন্তনী"। ইদানীংকালে আমরা সবাই দেখছি, এদেশীয় মুসলমান জীবনের গল্প লিখতে গিয়ে কিছু মুসলমান-নামধারী লেখক বাঙলা সাহিত্যে এক অদ্ভুত বিকৃত আর কুৎসিত রসের আমদানি করছেন। আগ্রহী মেজরিটি সম্প্রদায়ের পাঠকের কাছে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টিকে যতখানি সম্ভব ঘৃণ্যভাবে প্রকাশ করে বাস্তবতার নামে যাঁরা মিথ্যাচার করছেন, তাদের বিবেকের কাছে গৌরী আইয়ুবের এ দুটি গল্প অবশ্যই উদাহরণযোগ্য। বিস্ময়ের কথা, দুটি গল্পেরই চরিত্ররা বস্তিতে থাকে, সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষায় নিম্নবর্গীয় মানুষ। খুব সহজেই এদের জীবন নিয়ে বীভৎস রসের পাঁচন পরিবেশন করতে পারতেন লেখিকা। অথচ কী আশ্চর্য মমত্ব আর সহানুভূতি নিয়ে এইসব মানব-মানবীর ব্যক্তিগত গভীরে তিনি প্রবেশ করেছেন।

"ত্রিযামা" গল্পের 'বিবি' চরিত্রটি বাঙলা সাহিত্যে এক অসামান্য সৃষ্টি। যৌবনের আঁচ নিভু-নিভু হলেও প্রেম আর বাসনার সীমারেখা যে অন্তহীন, অস্থস্থ পুত্রের প্রতি বাৎসল্যরসও কিভাবে তুচ্ছ হয়ে যায়, বহতা জীবনের এই বিচিত্র বাস্তবতা আমাদের এক জটিল, দুর্লঙ্ঘ্য সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

তুলনায় সহজ রসের কাঠামো "চিরন্তনী" গল্পটির। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে রহিমা এসেছে তার বোনের বাড়িতে। নানারকম আলোচনা কথাবার্তার আনাচে-কানাচে স্বার্থপরতা, লোভ আর নীচতার ঘূর্ণি পাক খেয়ে যায়। নিম্নবিত্ত মুসলমান জীবনের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্রটিও নির্ভুলভাবে ফুটে ওঠে। তারই পাশাপাশি তিরতির করে বয়ে যায় কিশোরী হুসনার নীলাভ স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার ছোট্ট নদীটি।

দুটি গল্পেরই বড়ো সম্পদ নিম্নবর্গীয় মুসলমান জীবনের দৈনন্দিন সামাজিক আর সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের নির্ভুল ডিটেল। লেখিকার কাছে একটাই অভিযোগ, মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে কেন তিনি গল্প লেখেন না? আমরা জানি, স্বাধীনতা-পরবর্তী চল্লিশ বছরে পশ্চিমবাঙলার মুসলমান সমাজে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, এদেশে তার রূপ ও প্রকৃতি প্রথম চিহ্নিত এবং আবিষ্কার করেন গৌরী আইয়ুব।

বইটির চমৎকার মলাট এঁকেছেন শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী।

বেদনা কী ভাষায় রে

অশোক বাগচী

বেদনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই আমার সর্বপ্রথম স্মরণ হয় প্রয়াত তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা। তিনি তাঁর বিখ্যাত "অনুভব" কবিতায় লিখেছিলেন,

এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমাকে সেলাম।

কবিতাটি তাঁর রোগক্লিষ্ট যৌবনের মর্মবেদনার এক হৃদয়স্পর্শী প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর সব প্রাণীই বেদনা অনুভব করে, কিন্তু মানুষের মতো কেউ তা ব্যক্ত করতে পারে না। বাইবেলে লেখা আছে, আদিম পুরুষ আদমের একটি পঞ্জরাস্থি অপসারণ করে তা থেকে হবার জন্ম হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, আদমকে ওই অস্ত্রোপচারের আগে মাদক ভেষজাদি খাইয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল, নতুবা তিনি সেই প্রক্রিয়া বরদাস্ত করতেন না, এবং মানবজাতির উদ্ভবও হয়তো বিলম্বিত হত। এবার কল্পনা করুন মাতা হবার কথা। তিনি যখন কেইন, আবেল্, সেত্ এবং অন্যান্য সন্তান প্রসব করেছিলেন, তখন কি কোনো বেদনানাশক তাঁকে দেওয়া হয়েছিল? সে কথা বাইবেলের কোথাও বলা নেই। তিনি কী করে সেই প্রসববেদনা সহ্য করেছিলেন, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

বেদনা প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে তার প্রায় সবটাই ভাষাভিত্তিক এবং বেদনার প্রকৃত সংজ্ঞা আজও কোনো পণ্ডিতই দিতে পারেন নি। সারা পৃথিবীর ভাষাবৈষম্যের জন্য সকল গবেষকরাই প্রকৃত সংজ্ঞাকরণ এড়িয়ে নানাপ্রকার কাল্পনিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন।

শারীরবিজ্ঞানের গবেষণা সাধারণত মনুষ্যেতর প্রাণীদের উপরে করা হয়, কিন্তু বেদনার গবেষণায় সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নি। একটি হস্তীকে অস্ত্রাঘাত করলে সে বৃংহতিদ্বারা কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু সেই কষ্টের মাত্রা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না। সুতরাং মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়ে বেদনার গবেষণায় উপযুক্ত প্রতিরূপ। মানুষের বেদনার উপলব্ধি এবং প্রকাশ্য বর্ণনা থেকেই আমরা বেদনা সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানতে পেরেছি।

বেদনার বহু প্রকারভেদ আছে, এবং ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব উপলব্ধির উপরই সেই বিভাজন প্রতিষ্ঠিত। শিশুর জন্মের পর থেকে বিভিন্ন প্রকার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী জীবনে বেদনায় সহনশীলতা আর তার উপলব্ধি হয়। দরিদ্র পরিবারে যে শিশুর জন্ম হয়, তার বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা বিত্তবান পরিবারের শিশুর চেয়ে অনেক বেশি। কেননা, সামান্য-সামান্য বেদনায় দরিদ্র শিশু অনেক কম ক্লেশ পায়। পাভলভের "কনডিশন্ড রিফ্লেক্স" মতবাদ দিয়েই এই সহনশীলতার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, মানুষের ব্যক্তিগত বেদনাপ্রকাশের ভঙ্গি ভিন্ন। আফ্রিকার মাসাই-জাতীয় কোনো রমণীর বেদনা সইবার ক্ষমতা পারী-নিবাসিনী কোনো ফরাসি তিলোত্তমার চেয়ে অনেকাংশে বেশি। বেদনার উন্মেষও অতি বিচিত্র। কেননা, ক্লেশকর অথবা আরামদায়ক —উভয়প্রকার উত্তেজনা থেকেই বেদনার অনুভব হয়। যেমন ধরুন, মধ্যযুগে পায়ের চেটোতে পালকের সাহায্যে শুড়শুড়ি দিয়ে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত। চেটোতে অল্পবিস্তর শুড়শুড়ি বেশ উপভোগ্য আর আরামদায়ক। কিন্তু কোনো ব্যক্তির হাত আর পা বেঁধে যদি তার পায়ে শুড়শুড়ি দেওয়া হয়, তাহলে কিছুক্ষণ পরে শুড়শুড়ি বেদনায় রূপান্তরিত হয়। দসতয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজোভ" উপন্যাসে এইরকম একটি বিবরণ আছে।

ইন্দো-য়ুরোপীয়ভাষীদের মধ্যে বেদনার ভাষাগত বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। অর্থগত বিচারে, "বেদনা" কথাটি গ্রীক "পোনোস" আর লাতিন "পেইনা"-র সমার্থবাহী, এবং গ্রীক "ওদুনি" কথাটিও সমধর্মী। সংস্কৃত "ব্যথা" আর লাতিন "পেথোস"-এর অর্থ এক। সংস্কৃত "কষ্ট" লাতিনে "কান্তিগারে" এবং স্পেনীয় আর পর্তুগীজ ভাষায় "কাস্তিগো"। সেইরকম সংস্কৃত "দলিত" আর "দলন", লাতিনে "দোলোর", ইতালীয়তে "দোলোরে", "দোলোরোসো", "দোলোরোসা", ফরাসিতে "দোলিউর", "দোলোরু", স্পেনীয়তে "দোলোর" "দোলোরিদা", পর্তুগীজ "দোর" এবং বালুচি ভাষায় "দোর"-এর সমার্থক। ফারসি "দরদ্" কথাটির প্রকৃত অর্থ

অশোক বাগচী পেশায় চিকিৎসক, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন।

হৃদয়, কিন্তু সেটা বেদনার অর্থে ব্যবহৃত হয়; কেননা প্রাচীন ইন্দো-য়ুরোপীয় শারীরশাস্ত্রে হৃদয়ই অনুভূতির কেন্দ্র বলে গণ্য হত। প্রচলিত কথা জারমান ভাষায় বেদনাকে "ভে" এবং "ভেহেন" বলা হয়। শব্দ দুটি সংস্কৃত "বেদনা", প্রাকৃত "ভিয়ানা" এবং পুরাতনী বাঙলা "বিয়ানা"-র খুব কাছাকাছি।

বিখ্যাত ইংরাজ লেখিকা ভারজিনিয়া উল্‌ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) একবার লিখেছিলেন, English which can express the thoughts of Hamlet or the tragedy of Lear has no word for shiver and headache. ...The merest school girl when she falls in love, has Shakespeare and Keats to speak for her, but let a sufferer try to describe a pain in his head to a doctor and language at once turns dry.

সাতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমি জানাই যে, আমি এই কথাটি সমর্থন করি না। কেননা, লেখিকা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা ইংরাজিভাষিণী হয়েও ভুলে গিয়েছিলেন যে বেদনার বর্ণনায় ইংরাজি অতিশয় সমৃদ্ধ। ইংরাজি ভাষায় মূলত ষোলো রকম বেদনার বর্ণনা আছে, এবং সেই ষোলোটির চৌষট্টিটি সমার্থশব্দ আছে। আমাদের বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও এই তালিকাটি প্রযোজ্য। যদি বিজ্ঞানীরা কোনো বাঙালি বা ইংরাজকে বেদনার গবেষণার প্রতিরূপ হিসাবে মনোনীত করেন, তবে সমূহ সম্ভাবনা হবে। বাঙলা আর ইংরাজি ভাষায় বেদনার সমার্থক শব্দের প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আর অভিনয়ভঙ্গি যুক্ত হয়ে গবেষণাটি পণ্ড হয়ে যাবে।

মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে যে ইহুদি জাতি নির্যাতিত হয়ে চলেছে, সে কথা সুবিদিত। হিব্রু ভাষায় "কাইয়েভ" প্রধান বেদনাব্যঞ্জক শব্দ, সুতরাং ক্ষিষ্ট ইহুদিরা ইন্দো-য়ুরোপীয়দের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে বেদনা নিয়ে কাব্য রচনা না করে নির্বিবাদে বেদনা সহ্য করে চলেছেন। যীশু খ্রীষ্টের কথা আরামীয় ভাষাতেও বেদনাব্যঞ্জক শব্দ বিরল, তাই বোধ হয় তিনি নির্বিবাদে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার অপরিসীম কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন। তিনি যদি কোনো বাকবাগীশ বাঙালি হতেন তাহলে পরিস্থিতিটা কী হত সহজেই অনুমেয়!

আরবের যাযাবর বেদুইনেরা হাজার-হাজার বছর ধরে উষর মরুভূমিতে ক্লেশকর জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু তাঁদের মুখের হাসি কখনও মিলিয়ে যায় নি। কেননা তাঁদের ভাষায় মুখ্য বেদনার প্রতিশব্দ "অলম্"। কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের কথা ভাষাতেও বেদনাব্যঞ্জক শব্দ খুব কম, তাই তাঁরাও অত্যন্ত সহনশীল।

মারকিন দেশের কেনটাকি প্রদেশের লেকসিংটন কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীদের উপর বেদনানিবোধক ভেষজাদির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেসব গবেষণা বিশেষ অর্থবহ হয় নি। কেননা, ওই বন্দীদের অধিকাংশই সুরাপায়ী এবং মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত ছিল। ছোটোখাটো বেদনা তারা অনুভব করতেই পারত না।

ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন হানটার নিজের দেহের উপর বহু রোগসম্বন্ধীয় গবেষণা করেছিলেন। অস্ত্রপ্রভাবে, জারমান শল্যচিকিৎসক ভেরনের ফর্স্‌মান নিজের হাতের একটি শিরার মধ্য দিয়ে একটি নল হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দ আর নিলয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে এক যুগান্তকারী গবেষণা করেছিলেন, এবং ১৯৫৬ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ওঁদের মতো কোনো ব্যক্তি যদি নিজের শরীরের উপর বেদনার গবেষণা করতেন তাহলে হয়তো আমরা বেশ কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারতাম।

বাঙলা আর ইংরাজির মতো ফারসিও ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষা। বিখ্যাত আরবি চিকিৎসক ইবনে সিনা বা আভিসেন্না (৯৮০-১০৩৭) তাঁর লিখিত বিখ্যাত চিকিৎসা-পুস্তক "আল্ কানুন এল ফিতিব্বী"-তে পনেরো রকম বেদনার কথা বলেছেন।

দূর প্রাচ্যের চিত্রলিপিগোষ্ঠীর চীনা, জাপানি আর কোরীয় ভাষায় বেদনার বর্ণনা অতি সীমাবদ্ধ। চীনের প্রায় ৯০০ কোটি লোকের ভাষ্যে "থুং" অর্থাৎ সামান্য বেদনা, "সিউ সিউ থুং" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বেশি বেদনা এবং "হুল্‌ং থুং" অর্থাৎ প্রচণ্ড বেদনা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই! সুতরাং কোনো চীনাকে বেদনার গবেষণায় প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহারের ফল বিশেষ লাভজনক হবে না বলেই মনে হয়। চীনাদের জন্মগত বেদনার সহনশীলতার জন্যই বোধহয় মাও জেদঙের "দীর্ঘ পথপরিক্রমা" সাফল্য লাভ করেছিল। সেই একই কারণে আজও জাপানিরা তলোয়ার দিয়ে পেট কেটে "হারাকিরি" করতে পারে। জাপানি ভাষায় বেদনা প্রকাশের শব্দও মাত্র তিনটি—"ইতাই", "সুকোশী ইতাই" এবং "তাইহেন ইতাই"। কোরীয়, ভিয়েতনামি, কামুচীয়, মন্ খমের, লাওৎসীয় ও তাই ভাষাতেও প্রায় ওই একই অবস্থা। অবশ্য তাই ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর ভাষার এককালীন অবাধ মিশ্রণের ফলে সে ভাষায় বেদনার শব্দসম্ভার কিছু বেশি। ভিয়েতনামিদের বেদনার সহনশীলতার পরিচয় মারকিনি আক্রমণকারীরা স্বচক্ষে দেখে হতভম্ব হয়ে সে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

সভ্যতার আদিকাল থেকে চিন্তানায়ক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক আর দার্শনিকেরা বেদনাকে বোঝবার অনেক চেষ্টা করেছেন। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক ইপ্পোক্রাতেস ইরাক্লিদে বলেছিলেন, "Divinum est opus sedare dolorum" অর্থাৎ বেদনা নিরসন করা একটি পুণ্যকর্ম। "প্যারাডাইস লস্ট" পুস্তকে জন মিলটন লিখেছিলেন, "Pain is perfect misery, the worst of all evils" আরিস্ততল বলেছিলেন, বেদনা দেহ বা মনের অস্বস্তি মাত্র।

প্রখ্যাত পর্তুগীজ দার্শনিক এস্‌পিনোজা বলেছিলেন যে, বেদনা শরীরের স্থানবিশেষের আবেগাপ্লুত দুঃখের অভিব্যক্তি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে লিখেছেন,

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশি আছি নিদ্রাহারা বিরহে
তব নন্দনবনঅঙ্গনদ্বারে
মনোমোহন বন্ধু—
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।

বর্তমানের বৈজ্ঞানিকেরা এস্‌পিনোজার মতবাদকেই প্রাধান্য দেন।

শারীরস্থানবিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান, স্নায়ুতন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বেদনার সংজ্ঞাকরণের চেষ্টায় আমরা আজও যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি।

বেদনার উপযুক্ত চিকিৎসা আজও আমাদের অসাধ্য। আমরা নূতন-নূতন অবসাদক ভেষজাদি দিয়ে বেদনার সাময়িক নিরসন করতে পারি, কিন্তু বহু দুরূহ রকমের বেদনার চিকিৎসা আজও আমাদের অজানা। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আজকের পৃথিবীতে জীবাণুনিরোধক অ্যানটি-বায়োটিক-জাতীয় ভেষজাদির বিক্রয়ের অনুপাতে বেদনা-নিরোধক সুপরিচিত "অ্যাসপিরিন"-এর বিক্রি অনেক বেশি। আধুনিক শল্যচিকিৎসার দ্বারা স্নায়ুচ্ছেদ করে কিছু কঠিন ধরনের বেদনার উপশম হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট স্নায়ুটির কার্যকারিতা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রায় আমরা পৌঁছে গেছি, রকেটে চড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিচ্ছি। কিন্তু বেদনা আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেই চলেছে। তাই মাঝে-মাঝে বিখ্যাত মারকিন কৃষ্ণকায় সঙ্গীতজ্ঞ পল রোবসনের একটি গান মনে পড়ে—

Body all achin'
And racked with pain
That ole man river
Just keeps rolling along.....

কত যে সুখের স্মৃতি : বিভূতিভূষণ

করুণাময় মুখোপাধ্যায়

১

নিসর্গপ্রেমিক কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতার পটভূমি ছিল—বনগাঁ থেকে রানাঘাট ট্রেন লাইনের এই তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যেকার গ্রাম, গ্রামজ মানুষ, গ্রাম্য প্রকৃতি, ধুলোভরা গ্রামের পথ আর সেইসব জনপদ-ছুঁয়ে-যাওয়া একটি নদী—যা বহু ভাবে বহুরূপে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর রচনাতেও। “পথের পাঁচালী”, “ইছামতী”, “আদর্শ হিন্দু হোটেল” প্রভৃতিতে এই পটভূমিরই ছায়াশরীর। এ ছাড়া, পারিবারিক বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার সূত্র ধরে এ আলাপ, এ ঘনিষ্ঠতা পরবর্তী কালে আমার রিপন কলেজে পড়ার দিনগুলিতে আরো গভীর হয়ে ওঠে।

আসলে বিভূতিভূষণ আর আমার পিতৃভূমির দুটি গ্রাম বারাকপুর আর আকাইপুর—প্রায় পাশাপাশি। ট্রেনে করে বনগাঁ থেকে রানাঘাট যেতে মধ্যে তিনটি স্টেশন—গোপালনগর, মাঝেরগ্রাম আর গাংনাপুর। গোপালনগর রেল-স্টেশনে নেমে কাছেই আকাইপুর। অনেক সময় বিভূতিদা আর আমি বনগাঁ থেকে রেলে চড়ে গোপালনগরে নেমে আকাইপুর যেতাম। কখনো আবার হাঁটাপথে বনগাঁ থেকে আকাইপুর গিয়েছি। ঘনঘন যাতায়াত করতাম আমরা বারাকপুর থেকে আকাইপুর—সেটা অবশ্য গোপালনগর হয়ে, হাঁটাপথে। বনগাঁ থেকে হাঁটাপথে পাঁচ মাইল পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে পৌঁছতাম গোপালনগর বাজারে—তারপর কাঁচা রাস্তার ধুলোপায়ে কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে আকাইপুর পৌঁছানো যেত। আকাইপুর পার হয়ে রাস্তাটি এঁকেবেঁকে পশ্চিমে দশ মাইল দূরে রানাঘাটে গিয়ে মিশত। আর ওই পাকা রাস্তাটি বনগাঁ থেকে এসে চালকি-বারাকপুর অতিক্রম করে রেললাইনের লেভেল ক্রশিং পার হয়ে আরো পশ্চিমে চাকদায় গিয়ে পড়ত।

আমকাঁঠালজামলিচুগাছের আলোছায়াভরা এই পথ দুটির ধারে পদ্মবিল, আউশের খেত, বসন্ত-বর্ষা-শরতে, গ্রীষ্ম-শীতে-হেমন্তে তার ঋতুচক্রের পরিমণ্ডলে বার-বার রূপ পালটে আমাকে আত্মহারা করে দিত, কবি করে তুলত। বর্ষার দিন টোকামাথায় পরিশ্রমরত চাষিরা, মুর্শিদাবাদের থেকে দলে দলে আসা বেকার গ্রামবাসীরা আমন ধান কাটতে আসত, মাটি কেটে কাঁচা রাস্তা সারাতে আসত বাঁকুড়ার আদিবাসীরা। শীতের দিনে খেজুর গুড় জাল দেওয়ার গন্ধে ম-ম করত চারদিক। রূপরসগন্ধভরা এই প্রকৃতি আমার হৃদয় স্পর্শ করত।

এইখানেই বোধহয় বিভূতিদার সঙ্গে বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগত মানসিকতার মিল এবং একটা আত্মিক যোগ তিলে-তিলে গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে আমার অনেককাল ধরে—আমার নিজের অগোচরে।

যে পাঁচটি গ্রাম এবং ইছামতী নদী, বিভূতিদা ও আমার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল—এদের মধ্যে ইছামতীর কথা আগে বলি। এই নদী বারাকপুর আর গোপালনগর দক্ষিণে রেখে ক্রমশ উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত। বারাকপুরের পর মোল্লাহাটির সেকালের নীলকুঠি আর সাহেবদের দুর্গ—পরে তা ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ হল। এক বড়ো সাহেবের রক্ষিতা ছিল দেশী ‘গয়ামেম’। আজ দেখি সেই নীলকুঠি আর গয়ামেমের অতীত দিনের বিস্মৃত-কাহিনীবিধৃত গ্রামগঞ্জ ছাড়িয়ে ইছামতী চলেছে সরু শীর্ণ হয়ে। আকাইপুর থেকে ভিন্ন একটা কাঁচা রাস্তা উত্তরে চলে গিয়ে ইছামতীতে মিশেছে কাজিপুরের বাঁকে। দশহরা তিথিতে ইছামতী-জলাঙ্গী-মাথাভাঙার সঙ্গমে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্যফল পাওয়া যায়। বালক বয়সে গোরুর গাড়িতে চড়ে আকাইপুরের বৈষ্ণবী ‘সেবাদাসী’র সঙ্গে সেই সঙ্গমে স্নান করতে গিয়েছি। তা আজও ভুলি নি। সেই বালক যখন উদ্দীপিত যৌবনে রিপন কলেজে পড়ত, তখন বিভূতিভূষণের সঙ্গে অনেকবার বারাকপুরের ঘাটে ইছামতীতে স্নান করেছে, সাঁতার কেটেছে, নৌকো চেপেছে, গান গেয়েছে। মহাকালের বীথিপথে কত যুগযুগান্ত, কত মানুষজন এল গেল; বিভূতিদা নিজেও চলে গেলেন। একথা সত্য যে ইছামতী আজ আর আগের মতো তেমনটি বেগবতী নয়, কিন্তু তবু তো সে নদী। আমাদের দুঃখসুখের ঘরকন্নার সাক্ষী হয়ে আজও বয়ে চলেছে।

এখন বলি পাঁচটি গ্রামের কথা। এই গ্রামগুলি বিভূতি-স্মৃতির সঙ্গে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। ঘুরে-ফিরে এখানকার গ্রামের কথা বারে বারে উল্লিখিত হচ্ছে এবং হবে—বিশেষত চালকি, বারাকপুর, গোপালনগর, আকাইপুর ও গরিবপুর। এইসব গ্রাম আর তার সংলগ্ন কাঁচা-পাকা রাস্তাটি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জড়িয়ে ছিল বিভূতিভূষণের জীবনে ও সাহিত্যে। বিভূতিদার বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের চোখ ছিল এবং ঘরে বসে বিশ্বপরিক্রমা করার শক্তি আর দিব্যদৃষ্টি, মনে হয় জন্ম থেকেই ভাগ্যবিধাতা তাঁর ললাটে লিখে দিয়েছিলেন। ছোটো গণ্ডির মধ্যে বসবাস, জটিলসমস্যাহীন তখনকার গ্রামঘরের সাদাসিধা মানুষগুলোর ভেতর ঘোরা-ফেরা। তাদের ভেতরকার অন্তরসত্তাকে অবিরাম তিনি খুঁজেছেন এবং নিজের হৃদয়তন্ত্রীতে তার সুর বেঁধে নিয়েছেন। গ্রামভিত্তিক পারিবারিক স্নেহপ্রেমে-বাঁধা ঘরোয়া বৈঠকে জীবনদর্শনের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি। হয়তো আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বা অবচেতন মনের খোঁজ না নিয়ে তিনি সহজ মানুষটির অন্তরস্থিত বিত্তকে স্পর্শ করতে চাইতেন। তাই মনে হয় আজকের সামাজিক সমস্যার চেয়ে ব্যক্তিগত অল্পে সন্তুষ্ট জীবনযাপনের পথিকৃৎ হতে পেরেছিলেন বিভূতিভূষণ। আরও বড়ো কথা—পাঠক-পাঠিকার কাছে সেই সুর সোজা কথায়, কথার জাদুস্পর্শে হৃদয়-অনুভূতির মর্মমূলে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। এর ফলেই বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প এবং রসোত্তীর্ণ গদ্যকাব্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তার পটভূমিকা কী এবং কোথায়—তার সন্ধানে নিয়ত ভেবেছি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি—

“আদর্শ হিন্দু হোটেল”-এ বিভূতিভূষণ নিজে হাজারী-ঠাকুরের বেনামদার হয়ে নিম্নলিখিত পথে কয়েকবার যাতায়াত করেছেন—গ্রামের নাম ব্যতিরেকেই। তাঁর হাজারীঠাকুর কখনও হাঁটাপথে, কখনও রেলপথে গোপালনগর, গাংনাপুর, চাকদা—এই ত্রিভুজের মধ্যে বারবার পরিভ্রমণ করেছে। আমরা সিনেমায় দেখেছি পদ্মদিদির জরিমানার খরচ মিটিয়ে দিয়ে হাজারী ঠাকুর লুচিগুলি পুঁটলিতে বেঁধে গভীর রাতে গাংনাপুর স্টেশনে নেমে সত্য ঘটনা গোপন করে দরিদ্র বুভুক্ষ মেয়ের হাতে পুঁটলি তুলে দিয়েছে, দিতেই মেয়ে হর্ষে পুলকে বিস্ময়ে বলে উঠেছে : ‘বাবা, লুচি!’ ‘হ্যাঁ, মা, লুচি খাও।’ যদিও পাতানো মেয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অবশেষে নিজেই হোটেল খুলেছে “আদর্শ হিন্দু হোটেল”। তখন আবার ঐ পথেই উপন্যাসের হাজারী ঠাকুরকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল।

বিভূতিভূষণ “আদর্শ হিন্দু হোটেল” লেখবার প্রেরণা কিভাবে পেয়েছিলেন—তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (যদি তা আমার নিজস্ব ধারণা) হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। সাধারণ ধুতি, জামা ও জুতো পরে বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে ধুলো-ভরা পায়ে বিভূতিদা চলেছেন। পথে একজন পথযাত্রী পথিক পাওয়া গেল। পথের ধারে এক বাড়িতে তাঁর বিশেষ ভক্ত সাহিত্যপ্রেমিক এক জজসাহেব থাকতেন। সেখানে পৌঁছে তিনি জজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন পথিকটিকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর আসার পর সস্ত্রীক জজসাহেব কন্যাসহ বেরিয়ে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। উৎসুক পথিক তাঁর আসল পরিচয়টি জিজ্ঞেস করলে বিভূতিদা নিজের পরিচয় দিলে পথিকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠল—‘তাহলে আমিও বলি, আমি কে। আমার নাম হাজারী ঠাকুর। রানাঘাট স্টেশানের সামনেই আমার হোটেল।’ লোকটির এমন কেউকেটা ভাব দেখে তার গর্ববোধকে আরো বাড়ানোর জন্য বিভূতিদা ভাব দেখালেন ‘যেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিনতে না পারার অপরাধের জন্য ক্ষমা’ প্রার্থনা করছেন, বললেন—‘আপনি সেই হাজারী ঠাকুর, এতদিনে দেখবার সৌভাগ্য ঘটে নি।’ পরে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, ‘আমি ভাবতে লাগলাম এই লোকটি নিজের ব্যবসায়ে কত গর্বিত। সেই গর্বে সে কারো চেয়ে নিজেকে ছোট মনে করে না। আমি হাজার লেখক হই, লাখ আমার খ্যাতি থাকুক, কিন্তু হাজারী ঠাকুরও নিজেকে সেই শ্রেণীর মনে করে। সেই “আদর্শ”-গর্বে অভিভূত হয়ে আমি “আদর্শ হিন্দু হোটেল” উপন্যাসটা লিখি, (ড জে. এন. সিনহা)।

‘কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুর গেলাম, যেমন প্রতিবছর যাই’—লিখেছেন বিভূতিদা (উর্মিমুখর, ৩য় খণ্ড বিভূতিরচনাবলী)। সে কথা পড়ে সেই সময়কার তাঁর সান্নিধ্যের নানান স্মৃতি মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। বিভূতিদার বাড়িতে সকালে পৌঁছে, স্নান সেরে ওখানেই খেয়ে বিভূতিদা আর আমি একসঙ্গে চলেছি আকাইপুরের পথে। গোপালনগরের লেভেল ক্রসিং, শোঁড়ার বিল, পদ্মবিল, ডাইনে বাঁয়ে উন্মুক্ত প্রান্তর। খেজুরবাগান, কানসোনা গ্রাম, মেহেরপুর, বিস্তারিত খেত—এইসব ছাড়িয়ে পথক্লান্ত বিভূতিদার নির্দেশ—‘এবার একটু বসা যাক্। আজ্ঞাবহ ছোটোভাই-এর মতো আমি একমত হয়ে বললাম—‘পথের ওপাশে ৭নং লোহার পাতে ঠেস দিয়ে বসতে আরাম। চলুন না’—শুনেই বিভূতিদা

শিশুর মতো হয়ে গেলেন। সত্যিই ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে ঘাড় এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন। হাওয়ায় পদ্মবিলের পদ্মগন্ধ। বোষ্টমবাড়ি, গরুছাগল আটকে রাখার সরকারি পাউণ্ডঘর। মাঠঘাট, ছায়াঘন তেঁতুলগাছ, চড়কতলার পুকুর, কয়েৎবেল, বকুল, হলদে পলাশের গাছ —চতুর্দিকে রূপ রঙ গন্ধ। জিউসি ও তেঁতুল গাছ ডাইনে রেখে বাবার বাড়িতে ঢুকলাম দুজনে—হা-ক্লান্ত।

কিন্তু চেয়ারে একটু বসে ঘাম মুছে বিভূতিদা হঠাৎ বললেন—'তোমাদের ঐ একেদাদার ভাঙা, বিরাট তিনতলা বাড়িটা একবার দেখে আসি, চলো।' সাপখোপ-ভরা জঙ্গলাকীর্ণ নীলকুঠির আমলের বড়ো তরফের বাড়ি। বাড়ি নয়, যেন প্রাসাদ। প্রায় দুশো বছরের পুরানো প্রাসাদ ভেঙে-ভেঙে জরাজীর্ণ। 'দাঁড়ান, হাততালি দিতে-দিতে আস্তে-আস্তে এগোতে হবে, নতুবা আচমকা সাপে কামড়াতে পারে।' সেই বিরাট প্রাসাদের ভগ্নস্তূপের—বিভিন্ন অংশে ভাগে-ভাগে সহ-অবস্থান নীতি মেনে এক ভাগে রয়েছে "খৈয়ে-গোখুরা"র আড়ত, অন্যভাগে "চন্দ্রবোড়া"। "বেত-আছড়া" এবং লাউডগা সাপগুলো লতায়পাতায় ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে রঙে রঙ মিশিয়ে আত্মগোপন করে জড়িয়ে থাকে। গুপ্তধনের আশায় বোধকরি, অষ্টম প্রজন্মের এক বেকার বংশধর—নাম 'বেটো'—সাবেকি রান্নাঘরের পাশে ইটের তৈরি রোয়াক ও দেওয়ালে কূপের মতো গভীর গর্ত খুঁড়েছিল। বিভূতিদা জিদ ধরলেন ঐ গর্ততেই নামবেন। অগত্যা রাজি হয়ে আগেভাগে দমাদ্দম গোটা কতক আধলা থান ইট ছুঁড়ে বললাম—'আসুন, আমার হাত ধরুন, ইটের গাঁথনির খাঁজে-খাঁজে পা রেখে নেমে আসুন।'

ফেরবার সময় রাস্তায় নেমে বুঝলাম এই ভাঙাবাড়িটা তাঁর সাহিত্যের উপকরণ হবে। পরে জানলাম আকাই-পুরের পদ্মবিল, আমার মায়ের হাতের নিরামিষ রান্না তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকর্মে ব্যবহৃত হবে। কী ভাবে? এই প্রশ্নের জবাব এল—'ওসব এমনভাবে খোলনলচে পালটে দেব যে কেউ বুঝতে পারবে না।'

বাড়ি পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। দুজনকেই ভাইঝিরা তালপাখার বাতাস করতে লাগল। বিভূতিদাকে জিরিয়ে হাতমুখ ধুতে বলে মা আমাদের খাবার দেবার ব্যবস্থা করলেন। জলে ভেজানো আমের বালতি আর বঁটি এল। মযুরে পাথরে, জগন্নাকাঠের বিরাট তিলেপাথরের খোরায় থরে-বিথরে আম কেটে-কেটে সাজানো হচ্ছে। মা নিজেই করছেন এসব। বড়োবৌদি হ্যারিকেন জ্বালাবার আগাম প্রস্তুতি করতে-করতেই মাথার ওপর খোলা আকাশ হিরাকস রঙ পালটে লালচে-হলুদ হল—সূর্য অস্ত গেল। পূর্ণিমার চাঁদের আলো আকাশ জুড়ে। বড়ো ডোবার জলের ধারের রামেশ্বর আমগাছটি থেকে পাকা আম বৃন্তচ্যুত হয়ে জলে পড়ছে—শব্দ উঠছে ঘুপুত-ঘুপুত…ধপাস-ধপ।

আম খাওয়া শুরু হয়েছে। মা সহসা বললেন, 'এ কী বাবা, তুমি আরও খাও, খাচ্ছ না কেন? ওরে দুর্গা, পাথরের খোরাটা এদিকে এগিয়ে দে তো।' সলজ্জ হাসিমুখে বিভূতিদা হাত চিত করে বললেন—'আচ্ছা, মা, তাহলে আপনার পদ্মাবতী আম একটা দুটো দিন।' 'একটা দুটো কেন বাবা, পেট ভরে খাও। ভাত খেতে না হয় একটু দেরি হবে।'

বিভূতিদার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে, তাঁকে কাছ থেকে দেখার আর বোঝার সুযোগ পেয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মের পট-ভূমির সন্ধান পেয়েও হয়তো তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত ভাবনার সঠিক হদিশ পাই নি—বিভূতিভূষণের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এমন সব কত কথাই না মনে পড়ছে।

২

আমরা যখন রিপন কলেজে পড়ি, তখন "পথের পাঁচালী" বইটির জন্য বিভূতিভূষণের সংবর্ধনার একটি আয়োজন করে-ছিলাম। কোনো সাহিত্যিকের ঠিক তেমন জমজমাট সংবর্ধনা সেসব দিনে ছাত্র-অধ্যাপক-মহলে তখন প্রায় হতই না। আমাদের আগে প্রেসিডেনসি কলেজে "মৌরীফুল" গল্পের জন্য বিভূতিভূষণকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল বটে, তবে তা রিপন কলেজের অভ্যর্থনার মতো জমকালো হয় নি।

তখন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। বিভূতিভূষণকে মানপত্র দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে অভ্যর্থনা-সভার উদ্যোগ-আয়োজনের বিধিমত অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন এবং 'লিটারারি বোর্ড'-এর তহবিল থেকে কিছু টাকাও বরাদ্দ করেছিলেন। "বিচিত্রা" মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং আমাদের কলেজের তর্কশাস্ত্র আর দর্শনের বিভাগীয় প্রধান ড. সুশীলচন্দ্র মিত্র সে মানপত্র রচনা করেন এবং সেইসঙ্গে "বিচিত্রা"-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের, তাঁর এবং স্বয়ং বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত বন্ধুবর্গকে নিজে নিমন্ত্রণ করার দায়িত্বও নেন।

সংবর্ধনার দিন স্থির হয় ১২ই সেপটেমবর, ১৯৩৩। বিভূতিভূষণের সংবর্ধনা-আসরে কে সভাপতিত্ব করবেন, এবং কারা তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাবেন—এই নিয়ে আলোচনা করে স্থির করা হল, "সবুজপত্রে"র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীই সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁকে রাজি করানো যায় কী করে? তা ছাত্রদের একার কাজ নয়। উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলেন কলেজ-সমিতির পক্ষ থেকে "রামধনু" পত্রিকার তখনকার সম্পাদক (এবং "চায়ের ধোঁয়া", "হুকাকাশি" প্রভৃতি বইয়ের লেখক), কলেজের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং পৌরনীতি ও অর্থনীতির অধ্যাপক বিমলকান্তি মজুমদার। ছাত্রদের তরফে ছিলাম আমি। গেলাম সবাই তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে। প্রমথ চৌধুরী বেশ খুশি হয়ে সভাপতিত্ব করতে সম্মতি জানালেন।

এদিকে অভিনন্দনপত্র তৈরি হয়ে গেছে। বৃহদায়তন মূল্যবান কাগজে মুক্তোর মতো ঝরঝরে গোটা-গোটা অক্ষরে হাতে লেখা হল। পত্রখানির চারদিকে সোনার জলে বিচিত্র সুদৃশ্য ফুল আর লতার বর্ডার। সুরম্য নকশাকাটা কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই করে নিয়ে এলেন ড. সুশীল মিত্র নিজে। কিন্তু অভিনন্দনপত্রটি পড়বে কে? ড. মিত্র কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে মহড়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত সাম্মানিক অর্থনীতির চতুর্থ বর্ষের ছাত্র অনিল মুখার্জীর পড়াটাই বেশ উতরে গেল। তাকেই মনোনয়ন করে কয়েকবার তালিম দেওয়া গেল।

যাঁরা বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত বন্ধু, তাঁরা আবার সুশীলবাবুরও বন্ধু। "বিচিত্রা", "শনিবারের চিঠি", "প্রবাসী"-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণের ভার সুশীলবাবু নিজেই নিলেন। বিভূতিদা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং আরো কয়েকজনকে নিজেই বলবেন বললেন। ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র তাঁর এবং সুশীলবাবুর কাছে দেওয়া হল। বিভূতিদা আমার কাছে দুজনের কথা বিশেষ করে বললেন —যেন নিমন্ত্রণ করতে না ভুলি। বাঙলা সাহিত্যজগতে এবং আইন-ব্যবসায়ে প্রখ্যাত ব্যক্তি—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অপরজন প্রেসিডেনসি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. উপেন্দ্রকুমার ঘোষাল। অধ্যক্ষ ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত বন্ধু, তিনিই তাঁকে নিমন্ত্রণের দায়িত্ব নিলেন। এক সহপাঠীকে নিয়ে আমি পায়ে হেঁটে গোটা কলকাতার খাস এলাকা চষে ফেললাম। বেহালা, টালিগঞ্জ, বাগবাজার ইত্যাদি দূরাঞ্চলের নিমন্ত্রপর্ব রবিবারের ছ-আনার 'অল-ডে' ট্রামের টিকিট কেটে সাঙ্গ হল।

বোধকরি হেন সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক ছিলেন না, যাঁকে আমরা নিমন্ত্রণ করি নি। এঁদের অনেকেই পরবর্তী যুগে বাঙলা সাহিত্যের আকাশে জ্যোতিষ্কস্বরূপ গণ্য হয়ে-ছিলেন। এঁদের যোগদানে আমাদের আয়োজন সার্থক আর স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ছে—সভায় ছিলেন মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, (এবং সম্ভবত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)। আর ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, কবি জসিমুদ্দিন, কবি গোলাম মুস্তাফা, অজিত দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, সজনীকান্ত দাস, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বিভূতিবাবুর কলেজ-জীবনের সহপাঠী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে উৎসবের দিনটি এসে গেল। কলেজ-কমনরুমে সভার আয়োজন হয়েছিল। অত বড়ো ঘর ছাপিয়ে অগুনতি লোকের ভিড় রাস্তায় নেমে গেছে—বৈঠকখানা রোড এবং হ্যারিসন রোডের (ম. গান্ধী রোড) জংশন তখন লোকে লোকারণ্য। পথচলতি লোকের ঔৎসুক্যে জটলাও বড়ো কম হয় নি। ড. সুশীল মিত্র নিজে মির্জাপুর মেস থেকে বিভূতিদাকে আনতে গিয়েছেন; উৎকণ্ঠিত হয়ে আমরা কয়েকজন ছাত্র কলেজের সামনে প্রশস্ত ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে। ড. মিত্র দরজা খুলে বিভূতিদাকে হাত ধরে নামাচ্ছেন। তাঁকে দেখে আমি তো অবাক। আমাদের সেই চেনাজানা বিভূতিদা—হাফশার্ট গায়ে, বাঁ হাতে ধরা বিড়ি, আধময়লা ধুতির কোঁচা ডান হাতে—সেই চিরপরিচিত মূর্তি কোথায়? তার বদলে পাটভাঙা ফরাস-ডাঙার কোঁচানো ধুতি, চুনট-করা লম্বিত কোঁচা, গায়ে মুর্শিদাবাদি সিল্কের পানজাবি, সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। শুধু পোশাকে নয়, চেহারাতেও এক অন্যরকম গাম্ভীর্য। মির্জাপুর স্ট্রীটের সরল, হাসিখুশি, আমুদে, হইচইকরা সেই মানুষের অত পরিচিত চেহারা যেন অন্তর্হিত।

লম্বা-চওড়া ক্লাসরুমের পাটাতন চৌকি বেশ কয়েকটা একত্রে জোড়া দিয়ে প্রশস্ত মঞ্চ তৈরি হয়েছে। তার ওপরে চেয়ারে বসেছিলেন—মধ্যিখানে প্রমথ চৌধুরী। তাঁর এবং অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মাঝখানে বিভূতিভূষণ। একপাশে অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং অন্যপ্রান্তে উপেন্দ্রকুমার

ঘোষাল। পিছনের সারিতে কলেজের অন্যান্য কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক এবং কিছু অভ্যাগত আমন্ত্রিত অতিথি।

অতুলবাবুর বক্তৃতাই হল সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্য-রসসিক্ত অনুপম এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ—বিভূতি-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ এবং অপু-চরিত্র সৃষ্টির মূলরহস্য। কিভাবে অপু নিভৃত পল্লীর ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেঙে বহু বাধাবিঘ্ন, প্রলোভন, অর্থ আর যশের মোহ কাটিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রকৃতির রহস্যভরা রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে সদানন্দ চিত্তে সত্যিই অপরাজিত রয়ে গেল। কখনও হার মানল না। সেই ব্যাখ্যা এত মনোরম আর ভাবোদ্দীপক হল যে, বিদগ্ধ শ্রোতারা যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন। ভাষণের আন্তরিকতায়, বিশ্লেষণের পারদর্শিতায়, ভাষার মাধুর্যে এবং গম্ভীর স্বরক্ষেপণের ধ্বনিতে সভা যেন গমগম করছিল। অধ্যক্ষ, বিভূতিভূষণ, সভাপতি স্বয়ং—সবাই উৎকর্ণ হয়ে তাঁর ভাষণ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

সভাপতির ভাষণে প্রমথ চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে টেবিলে ভর রেখে নদীয়া-কৃষ্ণনগরের সুমিষ্ট সুরে অনুচ্চকণ্ঠে আস্তে-আস্তে বলতে শুরু করলেন। 'পথের পাঁচালী'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'বইখানিতে নদীয়া জেলার—বিশেষত কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ি, বা তার চারিদিকের পারিপার্শ্বিকের বেশ প্রতিফলন ঘটেছে। নদীয়া-যশোরের গাছপালা, ফুলফল—সমগ্র প্রকৃতির পরিবেশ এর পাতায়-পাতায় সজীব হয়ে উঠেছে। বইখানি পড়তে-পড়তে আমি আমার শৈশবের স্বপ্নমাখা দিনগুলি ফিরে পেয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য...' তারপর লক্ষ করা গেল প্রমথবাবু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে গেলেন। বুঝেছিলাম তাঁর শরীরটি ভালো নেই, বার্ধক্য আর অসুস্থতার জন্য দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। পাশ ফিরে বিভূতিদাকে লক্ষ করে বললেন—'ইটা ছাপানোর পর আজও তার এক কপি পাই নি—বিভূতি বলেছিল এক কপি দেবে, কিন্তু আজও দেয় নি।' সেই সময় বিভূতিদা যেন ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে—এই ভাবটি দেখাতে মাথা একটু নীচু করলেন।

অবশেষে বিভূতিভূষণ অভ্যর্থনার উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাত পিছনে আর বাঁহাতে টেবিলের ওপর রেখে খুবই নীচুস্বরে দু-চার কথা বলতে শুরু করলেন। আমাদের অনেকের কাছে তাঁর স্বল্পবক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল। মেসে বসে, ঘরোয়া বৈঠকে, মজলিশি আসরে, এমন-কী রাস্তায় চলতে-চলতেও—সব সময় স্পষ্ট উচ্চারণে বিন-রিনে গলায় তাঁর অনর্গল স্বচ্ছ প্রকাশে সুন্দর গোছানো বর্ণনা শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম। বিশেষ কিছুই বললেন না। বোধহয় খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। এই সভা যে তাঁকে কেন্দ্র করেই—এই অনুভূতিটি হয়তো তাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়ে থাকবে। সম্ভবত বিগত দিনগুলির স্মৃতি তাঁকে আনমনা করে দিচ্ছিল, এই পরিবেশের মাঝখানে তাঁর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ভাবের আবেগে ভারাক্রান্ত হবার ফলে তাঁর মুখের ভাষা যাচ্ছিল ডুবে।

তিনি বললেন, 'আমি ভালো বক্তৃতা দিতে পারি না। আজ এখানে এসে আমার অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়ছে। প্রথমেই মনে পড়ছে—আপনাদের বলি—আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কলেজের সামনে একটা পানের দোকান ছিল। আজ এসে প্রথমেই সেটাকে সেই জায়গায় দেখে পুরোনো দিনের স্মৃতি একেবারে পরিষ্কার আমার মনে ফিরে এল। আর একটা কথা বেশ মনে আছে—সে সময় আমাদের ইতিহাস পড়াতেন অল্পবয়সী এক অধ্যাপক, তখন নতুন এসেছেন। তাঁর পড়ানো এত ভালো লাগত যে, যেদিন তিনি আসতেন না বা ক্লাশ নিতেন না, সেই দিনটাই মনে হত বৃথা গেল। মনে হত কলেজে আসাই অনর্থক হয়েছে।'

সাক্ষাৎকার

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা প্রেমানন্দের মুখোমুখি—

[মাস ছয়েক আগে কোলকাতায় এসেছিলেন বি. প্রেমানন্দ। পুরো নাম বাসব প্রেমানন্দ। ৬ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ কোলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামে শহরে অর্ধশতাধিক 'মিরাকল্ শো' নামক অনুষ্ঠানটি করে গেলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিবিধ সূত্র আর হাতের কারসাজির সাহায্যে প্রেমানন্দ সেইসব 'মিরাকল্' দেখিয়ে আলোচনা করেন, যেসব 'মিরাকল্' দেখিয়ে থাকেন 'অলৌকিক' গুরুদেব আর সাধুবাবারা। কেরালা র‍্যাশনালিস্ট্ অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, ইনডিয়ান র‍্যাশনালিস্ট্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক, আব্রাহাম কভূরের যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা এই প্রেমানন্দ ৫৮ বছর বয়স পেরিয়েও সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন জেলায়—প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও ভয়দেহ নিয়ে তাঁর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধ সমস্ত অলৌকিক তত্ত্বমাধারী গডম্যানদের বিরুদ্ধে। পূর্ব-পুরুষ গোয়ানিজ, জন্ম কেরালায়। বর্তমানে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের বাসিন্দা প্রেমানন্দের প্রথাগত ডিগ্রীশিক্ষা বেশি নয়। প্রথম জীবনে ঘোরতর আস্তিক, সংস্কারবিশ্বাসী এই মানুষটিই শতাধিক সন্ন্যাসীর কাছে, মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরেছিলেন ঈশ্বরের খোঁজে। আর এখন? সমস্ত রকম অলৌকিক সংস্কার থেকে মুক্ত মানুষের খোঁজে তাঁর অক্লান্ত এই অভিযান।]

—আপনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে গ্রামে 'যুক্তিবাদী ম্যাজিক শো' করে বেড়ান। আবার অলৌকিকতা, কুসংস্কার, ঈশ্বরবাদ, ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কিছু বইপত্রও লিখেছেন। ম্যাজিক আর লেখালেখি, এই দুই ভিন্ন মাধ্যমে এত অনায়াস আত্মপ্রকাশ ঘটানকী-ভাবে?

প্রেমানন্দ—একজন ব্যক্তি যা করেন এবং যা তিনি করতে চান, এই দুয়ে মিলেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। আমি যা করছি এবং যা করতে চাইছি, দুয়ে মিলেই আমি। আবার, আমি যা করি, তার পিছনে আমার বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ—এসবই সক্রিয়। তাই এই বিশ্বাস আর বোধের চেহারাটাও আমার অস্তিত্বের একটা সূত্র। এই সূত্রে ধরেই কিন্তু আমার ভালো-লাগা কাজকর্মের জগতে ওই লেখালেখি এবং ম্যাজিকের প্রবেশ আর অনুশীলন। কৈশোরে আমিও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলাম। বেশকিছু মধ্যযুগীয় কুসংস্কার আর প্রথায় বিশ্বাসীও ছিলাম। ঈশ্বর আছেন কিনা কিংবা কোথাও

অলৌকিক বা মিরাকল্ কিছু ঘটে কি না, এসব জানতেই যুবক বয়সে ভারতের বিভিন্ন উপাসনালয়ে, তীর্থক্ষেত্রে ঘুরেছি। তখন কিন্তু আমি ম্যাজিক দেখাতাম না। লিখতামও না। কারণটা? ধর্মীয় গুরুদেবরা তাঁদের 'অলৌকিক' শক্তির প্রকাশ অজস্রধারে অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটিয়ে চলেছেন। আমার আর প্রেমানন্দবাবা সেজে অলৌকিক খেলা দেখানোর প্রয়োজন ছিল না। আর অলৌকিকতার পক্ষে লেখালেখি এত হচ্ছে রোজ, যা পুড়িয়ে ছাই করলে সে ছাই দিয়ে যে পরিমাণ বিভূতি তৈরি করা সম্ভব, তা দিয়ে পৃথিবীসুদ্ধ আস্তিক ও নাস্তিক সকলের কপালেই আগামী একশো বছর ধরে বিভূতির তিলক দেওয়া সম্ভব। যাই হোক—যখন যৌবনের সংশয় বাড়তে বাড়তে প্রায় দৃঢ় একটা সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছি, সেই সময়টায় লেখালেখির অভ্যাস শুরু করি। আমি যেসব ভারতীয় সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি এবং যেভাবে আমি নিজেকে সেইসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছি, তারই অনিবার্য প্রকাশ হিসেবে এই লেখালেখি আর ম্যাজিক দেখানোর মধ্যে নিজেকে নির্মাণ করা। ঈশ্বরবাদ, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার তথা সবরকম অমানবিক সামাজিক সত্যের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাতে চাই। সেই বিরোধী যুদ্ধের হাতিয়ার আমার কলম, আমার হাতসাফাই তথা ম্যাজিকের কৌশল এবং সত্যকে পরীক্ষা আর পুনর্বিবেচনার র‍্যাশনাল দৃষ্টি। তবে হ্যাঁ, লেখালেখি আর ম্যাজিকের সৃজনশীলতার সাথে আমার এখন একটা ভালোবাসা হয়ে গেছে। কিন্তু, স্থূলজীবনে বড়ো হয়ে কী হতে চাই বিষয়ে রচনা লিখতে বসে কখনোই লেখক বা জাদুকর হবার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। আমার জাদুপ্রতিভা বা সাহিত্যপ্রতিভাও নেই। অতএব এই দুই মাধ্যমে আমার আত্মপ্রকাশ না অনায়াস, না স্বজনধর্মী। আমি প্রচারক। অন্ততর অর্থে সাংস্কৃতিক কর্মী। ঠিক এই অর্থেই, আমি নিছক ম্যাজিশিয়ান নই। তাই, আমি ম্যাজিক দেখাই না। সাঁইবাবা প্রমুখ ধর্মগুরুরা যেসব ম্যাজিক আর হাতসাফাই দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানিয়ে ব্যাবসা করেন, আমি সেইসব খেলা দেখিয়ে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে দিই। আমি নিজে একটাও মৌলিকসৃষ্ট কোনো ম্যাজিক দেখাই না। অঘোষিত বাবা-মায়েরা যেসব 'অলৌকিক' খেলা দেখান, আমি দীর্ঘকাল ধরে ঘুরে-ঘুরে সেসব সংগ্রহ করেছি। আমার অনুষ্ঠানের নাম তাই 'ম্যাজিক শো' হাথার বিরোধী আমি। 'মিরাকল্ শো' নামটাই ব্যবহার করি।

—কিন্তু 'মিরাকল্' কিছু তো 'শো' করেন না—

প্রেমানন্দ—অনুষ্ঠানে যা দেখাই, তার জন্য কোনো অলৌকিকতা দাবি করি না। বরং প্রতিটি প্রদর্শিত খেলাই যে নিছক ম্যাজিক, তাই এক্সপোজ করি। অনুষ্ঠানটির নাম বরং 'মিরাকল্ এক্সপোজার শো' হওয়াই সংগত। আমরা ছোটো করে 'মিরাকল্ শো' বলি। আর সাধারণ বিনোদন-মূলক ম্যাজিক শো-এর সাথে চরিত্রগত পার্থক্য বজায় রাখার প্রশ্নও আছে। বিশ্বের অধিকাংশ জাদুবিদই তো মিরাকলের বিরুদ্ধে। কারণ, তাঁরা জানেন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের কিছু সূত্র আর হাতসাফাইকে কাজে লাগিয়েই প্রাগিতিহাস থেকে যাবতীয় ডাকিনীবিদ্যা, ওঝাতন্ত্র, ধর্মীয় বুজরুকি চলে আসছে। কিন্তু এই ম্যাজিশিয়ানরা নিজেরা অলৌকিক শক্তিকে এক্ষেত্রে বিশ্বাস না করলেও, এই সার্বিক পরলোক-বাদ, ধর্মান্ধতা, গুরুবাদের বিরোধিতা করতে রাস্তায় নামতে অধিকাংশই চান না। আর আমরা ঠিক এইখানটাতেই স্বতন্ত্র। একটা অঞ্চলে গিয়ে আমরা যখন শো করি, তখন ওই অঞ্চলেরই স্থানীয় সংগঠনের কাছ থেকে জেনে নিয়ে এমন ঘটনা আর কুসংস্কারগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, যা ওই অঞ্চলের জনগণ বিশ্বাস করেন। মানে, আমার তো নিজস্ব জাদুক্ষমতা দেখানোও উদ্দেশ্য নয়। গুরু-বাবাজীদের প্রতারণা থেকে জনগণকে আত্মরক্ষার প্রশ্নে সচেতন করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

—সাধু-সন্ন্যাসী, বাবাজী এদের সবাইই কি 'অলৌকিক মিথ্যাচারকে' পুঁজি করে ব্যাবসা করেন?

প্রেমানন্দ—সবাইই ঠিক একভাবে এক পরিমাণে ব্যাবসা করেন না। বা, করার ম্যানেজমেনট জানেন না। কিন্তু, প্রায় সবারই স্বার্থ হল, নিজের আয়বৃদ্ধির স্বার্থে ভক্তজনের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসকে প্রতারণা করা। এটা এক ধরনের এক্সপ্লয়টেশন। কারণ, ভক্ত তাঁর অর্থ, সময়, শ্রম ও বিশ্বাস ইনভেস্ট করছেন, কিন্তু বিনিময়ে পাচ্ছেন প্রতারণা আর মোহ। আর প্রতারক ধর্মগুরুটি সমস্ত অর্থই আত্মসাৎ করছেন। হয়তো বলবেন, হাজার-হাজার দরিদ্র নিরাশ্রয় সাধুসন্ন্যাসীও তো আছেন, যাঁরা ব্যাবসা করেন না। কিন্তু এঁরা বড়ো ব্যবসা না করলেও, লোকঠকানো ছোটো ব্যবসা করেনই। ছোটো অথবা বড়ো যাই হোক, পদ্ধতি তো একই। মানুষের ভক্তি, ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারকে এক্সপ্লয়েট করে নিজে ভোজগার করা। আমাদের আপত্তি এই লোকঠকানো ব্যাবসার বিরুদ্ধেও, ব্যাবসার পুঁজি ওই কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও। আর তাই ওই আঞ্চলিক সংস্কার ও প্রতারণাগুলোকে প্রাধান্য দিই।

—আঞ্চলিক সংস্কার বা ভণ্ডামির ব্যাপারটা—

প্রেমানন্দ—কেরালা, কর্ণাটকে সাঁইবাবা কিংবা অন্য কোন উপদেবতার ফটো থেকে অনবরত বিভূতি পড়ার ঘটনাটি বহু ভক্তের বাড়িতেই চোখের সামনে রোজ ঘটে চলেছে। একজন ভক্ত এই ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষটির ফটো কিনে এনে ঘরে টানিয়ে রেখে মহাপুরুষের অসীম অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ চাক্ষুষ করেন। শুধুমাত্র এই ঘটনাটিই দেখে যে-কোনো সংস্কারাচ্ছন্ন দুর্বল মানুষের মনে ঐ বাবাদেবতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর অন্ধ নির্ভরশীলতা জন্মাবে। অথচ ঘটনাটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিজ্ঞানের সাহায্যেই ঘটানো হয়। সাঁইবাবা প্রমুখদের নিজস্ব কিছু আশ্রম, মন্দির, ট্রাস্ট-অফিস বা দোকানেই এ ধরনের ফটো বিক্রি হয়। ফটোর ফ্রেম অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, বিক্রির সময় কায়দা করে তাতে মাকিউরিক ক্লোরাইড লাগিয়ে দেয়। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে এবং অনবরত ছাইয়ের মত গুঁড়ো তৈরি হবে। এটাই বিভূতি। ফটোর কাঁচে ল্যাকটিক অ্যাসিড ঘষেও এরকম বিভূতি তৈরি হয়। কাঁচে খাঁটি ঘনীভূত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে, তার সামনে ধূপকাঠি জ্বালালে, ধূপের থেকে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়ে ওই অ্যাসিডের সাথে মিলেও ছাই তৈরি হবে। এই ফোটো-বিভূতির অলৌকিক বুজরুকিটি মূলত দক্ষিণ ভারতেই জন-প্রিয়। তাও, কেরালা-কর্ণাটকের কিছু জেলাতেই এটির রমরমা বেশি। উত্তর বা পূর্ব ভারতে এই ঘটনাটির চল খুব কম। কিংবা যদি, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে কোনো গ্রামে যান, সেখানে বাটিচালান, কড়িচালান, জলপড়া, পিঠে থালা বসানো ইত্যাদি ওঝাবিদ্যার প্রতারণা বেশি। পুনার কাছে এক মফসলে কামার আলি দরবেশের দরগায় স্থানমাহাত্ম্যের বুজরুকির নাম করে ভারী পদার্থের ওজন তোলার ঘটনাটি রোজই কয়েকশো লোকের সামনে ঘটানো হয়। চার-পাঁচজন লোক একটি সস্তর চার-পাঁচটি ভরকেন্দ্রে হাত দিয়ে নিছক সময়ের নির্ভুল হিসেবে একতালে বস্তুটিকে তুলে ধরে। এটা আমি আপনি সবাই পারি। অথচ এ ঘটনা দেখিয়েই বেশ রোজগার হচ্ছে। এরকম প্রচুর আঞ্চলিক কুসংস্কার বা প্রতারণা আছে, যা ওই অঞ্চলে সর্বাধিক শক্তিশালী।

—ওই যে ছোটো-ছোটো হাজার-হাজার দরিদ্র প্রতারক সাধুর কথা হচ্ছিল, সে প্রসঙ্গে একটা জরুরি প্রশ্ন রয়েছে। কিছু-কিছু সমাজবিজ্ঞানী আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের এরকম একটা মতামত আছে যে, টাটা-বিড়লার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি থাকলে লড়াই করো। পারলে কোটিপতি সাঁইবাবা, রজনীশ কিংবা জ্যোতিষের গ্রহরত্নবিক্রেতা বড় জুয়েলারী সংস্থা বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করো। কিন্তু গৃহস্থবাড়ির ছোটো পুরোহিত, রাস্তার গণক, গরিব সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই করে, তার পেটের ভাত বন্ধ করাটা কি মানবিক?

প্রেমানন্দ—অত্যন্ত দুরূহ প্রশ্ন। বড়ো প্রতারণার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মাত্রায় লড়াই করলেও নিশ্চয়ই কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। প্রশ্নটা গরিব প্রতারকের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে আগে থেকে কোনো ফয়সলা দেওয়া সম্ভব নয়। স্থানীয় প্রতিবাদকারীরাই নির্ণয় করবেন, ওই প্রতারকটির প্রতারণার ফলে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে কি না। যদি মানুষের ক্ষতি হয়, তবে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রয়োজনে প্রতারককে শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই আইনি পথে। প্রতারকের বা তার পরিবারের পেটের ভাত বন্ধ করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যুক্তিবাদী বা র‍্যাশনালিস্ট মুভমেনট কিংবা পিপলস সায়েন্স মুভমেনট কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলন—সব কিছুরই লক্ষ্য সংখ্যা-গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির মৌলিক প্রগতি। মানুষের সংস্কৃতি চিন্তাচেতনা থেকে পারলৌকিক প্রভাব, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ক্ষতিকর গুরুবাদ ইত্যাদির বিলোপ ঘটিয়ে এক বৌদ্ধিক মানবিক সংস্কৃতির ভিত গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আর 'মিরাকল্ শো' সেই লক্ষ্যের পথে এগোনোর একটা হাতিয়ার। আমরা কিন্তু প্রতারক ধর্মগুরুদের মুখো-মুখি হই বহুবার। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ করি না। অনুসন্ধান করি তথ্যের, সত্যের। আমরা মূলত জনগণের সামনেই বারবার হাজির হই। তাঁদেরই অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্ন করি।

—একটা গ্রামে একটা অনুষ্ঠান করলেন। সেটা দেখে কজনের বিশ্বাস-সংস্কারের কতটুকু পরিবর্তন ঘটতে পারে?

প্রেমানন্দ—এটাও আগে থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের এটা একপেরিমেনটাল প্রপাগানডা। আর এ পরীক্ষার ল্যাবরেটরি আপামর মানুষজন। মানবমন অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সেখানে অঙ্কের সূত্রে নির্ভুল হিসেব করা অবাস্তব এবং অসম্ভব। আমরা শুধু সম্ভাবনার ওপর ভরসা করছি। একটা অঞ্চলের শ্রোতা-দর্শকের সংস্কৃতি,

বিশ্বাস, রীতিনীতি মানসিক পরিমণ্ডলের কথা যত ভালো ভাবে জানা থাকবে আমাদের, যত সঠিক গ্রাহ্যতর ভঙ্গিতে তথ্যগুলো জানাতে পারব তাঁদেরকে, অর্থাৎ most effective communication তৈরি হবে, ততই তাঁদের চেতনায় নাড়া দেবার ক্ষমতা জন্মাবে আমাদের কাজকর্মের। তবে, ওপর থেকে জ্ঞানদানের চেষ্টায় কোনো কাজ হয় না। আর, একটা গ্রামের একটা অনুষ্ঠান দেখেই বাস্তব কোনো উল্লেখযোগ্য চেতনাগত পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম। ওই গ্রামের, তার আশপাশের অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার উল্লেখযোগ্য বদল না হলে, গ্রামবাসীদের অধিকাংশেরই কোনো চিন্তার বদল হবেই না। আমাদের মিরাকল্ শো, পোস্টারিং, বক্তৃতা, নাটক—এসব তাঁদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন তুলবে, ভাববে। তার বেশি কিছু এখনই হবে না।

—যদি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাই চূড়ান্ত নির্ধারক হয়, তাহলে···

প্রেমানন্দ—তাহলেও, এ ধরনের প্রচার আন্দোলন চালাতেই হবে। কারণ, এতে অনেকটাই কাজ হতে পারে, যদি দক্ষ-ভাবে করা যায়। আর হাঁস আগে, না ডিম আগে, এ তর্কটা এখন অবান্তর। যান্ত্রিক বস্তুবাদ অর্থনীতিকেই একমাত্র নির্ধারক মনে করে। যান্ত্রিক ভাববাদ চেতনাকেই একমাত্র নির্ধারক মনে করে। কিন্তু অর্থনীতিক কাঠামো আর সংস্কৃতি উভয়েই উভয়ের ওপর ক্রিয়াশীল এবং নিয়ন্ত্রকও বটে। মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কেন, দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করে কেন, গুরুদেবের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে কেন, ভাগ্য ও জ্যোতিষ মানে কেন—এসবেরই উত্তর ইকনমিকসে আছে বললে, ঐ 'সব বাদে আছে'-র মতোই শোনাবে! তবে হ্যাঁ, সমস্ত চিন্তা, চেতনা, সংস্কার, বিশ্বাস তো সমাজ থেকেই উদ্ভূত। তাই, একটা দেশ বা রাজ্য বা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল না বদলালে, সার্বিক অর্থে ওই দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতির আমূল বদল হবে না। এই কথাটাও যান্ত্রিক। কারণ, একই অর্থনীতি এবং প্রায় একই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও তামিলনাড়ু ও কেরালার মধ্যে সংস্কৃতির ভিন্নতা অনেক বেশি।

—সংস্কৃতি আর চেতনা অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আর স্বাধীন?

প্রেমানন্দ—স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে স্বাধীন। আইন আর কুসংস্কারের একটা প্রাসঙ্গিক তুলনায় বিষয়টি স্পষ্টতর হবে। ইচ্ছে করলেও, প্রয়োজন হলেও, মানবিক দাবি থাকলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারের প্রশ্ন এলেও, আমরা আইন ভঙ্গ করতে পারি না। যদিও বা কোনো দুঃসাহসী তা করে, তবে সে রাষ্ট্রের কাছে অপরাধী এবং সে শাস্তি পাবে। কিন্তু কুসংস্কার মানলে মান, না মানলে মেনো না। কেউ তার জন্যে সরকারি শাস্তি পাবে না। তবে, আগেকার দিনে কোনো সামাজিক সংস্কার না মানলে ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে শাস্তি দিত। ব্রাহ্মণ শাসনে এ ধরনের অত্যাচার সুলভ ছিল। আজ কিন্তু কোনো তথাকথিত উচ্চবর্ণ, উচ্চধর্মের ক্ষমতাবান ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান কোনো দুর্বল, ক্ষমতাহীন মানুষের সংস্কার অমান্যের শাস্তি যদি দেন, তাহলে সেই সংস্কার-বিরোধী মানুষটি আইনের সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু সংবিধান না মানলে, যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার বিরুদ্ধে আর মামলা করা যায় না। এবং এই সংবিধানের বহু কথাই তো ক্ষতিকর আর মানবতা-বিরোধী। সর্বোপরি, কোনো বিচারবিবেচনা না করেই সংবিধান মানতে হয়, অন্ধবিশ্বাসের মতো। তো, সংবিধানকে কি কেউ কুসংস্কার বলবেন? কেউ নয়। আসলে, আইন প্রত্যক্ষত অর্থনীতিক এবং চরমত রাজনীতিক কাঠামোর অনিবার্য সারাংশার। তাই, আর্থ-রাজনীতিক কাঠামো বদলের সাথে-সাথেই আইন বদল হয়। কিন্তু সংস্কার, রীতিনীতি, প্রথার বদল হয় না। কারণ, বিশ-ত্রিশ হাজার বছর ধরে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্মাচার, অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস—এসব তো এখন সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যেন! শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপের সংস্কৃতি বদলেছে আমূল, এ দাবি কেউ করেন না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ওইসব দেশের সংস্কৃতি বদলেছে খোলনলচেসহ, এ দাবিও হাস্যকর। সে কারণেই, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জরুরি প্রয়োজন আছেই।

—কিন্তু, দেশ জুড়ে মানুষের কাছে পৌঁছনোর ক্ষমতা তো এই ছোটো-ছোটো যুক্তিবাদী ও পিপলস সায়েন্স গ্রুপগুলোর নেই। বরং রাজনৈতিক দলগুলোর সে-ক্ষমতা আছে। যদিও সচেতনতা এবং আদর্শের প্রশ্ন আছে।

প্রেমানন্দ—আমার জানা নেই, এই সার্থক আর গ্রাহ্যতম কমিউনিকেশন, মানে জনতার কাছে পৌঁছনোর সহজতম পথ কী। এটা ঠিকই, র‍্যাশনালিস্ট্ সংগঠনগুলো এখন ছোটো। তারা ভোটেও দাঁড়ায় না, জনসমর্থন আদায়ের কোনো স্ট্যাটেজিই তাদের নেই। নির্বাচনপ্রার্থী রাজনীতিক দলগুলোর তা আছে। দরিদ্রশ্রেণীর বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সংগঠনের মধ্যেও পার্টিগুলোর প্রভাব আছে। এটাও ঠিক, মানুষ তার আর্থিক সমস্যা নিয়েই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হতে বাধ্য। ফলত, রাজনৈতিক দলগুলো যদি সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইস্যুগুলো নিয়ে সত্যিই গুরুত্ব-সহ কাজ করত, তাহলে তারাই সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিকাশে জরুরি ভূমিকা নিতে পারত। কিন্তু, এদেশে অত্যন্ত কুৎসিত ব্যাপারটাই ঘটছে। হাজারো দেবদেবী আর ধর্ম-আচার, ধর্মীয় উৎসবকে সরাসরি মদত দেওয়া, ধর্মগুরু আর উপাসনালয়গুলোর ভণ্ডামি আর দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে শুরু করে, সাম্প্রদায়িকতা, সতীপ্রথা, ডাইনিহত্যা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নৈরাশ্যজনক তো বটেই, বহু ক্ষেত্রেই অত্যন্ত বিপজ্জনক আর ক্ষতিকর। সাম্প্রতিক বাবরিমসজিদ-রামজন্মভূমি সংঘর্ষ, মুসলিম পার্সোনাল ল বিতর্ক, আম্বেদকরের 'রিডলস ইন হিন্দুইজম' নিয়ে সংঘাত, রামায়ণ নিয়ে ধর্মোন্মাদনা, সতীদাহ, কুম্ভমেলা, হিন্দুএকতা যজ্ঞ ইত্যাদি ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে দেখুন প্রতিটি ক্ষেত্রে পার্টিগুলো নিজেদের ভোট আর দল ভারী করার স্বার্থে পশ্চাৎপদ মানববিদ্বেষী প্রথা আর মূল্যবোধকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। পার্টিগুলোর এরকম ভূমিকার একটি কারণ, দেশের রাজনৈতিক নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই নিজেরা irrational, কুসংস্কারগ্রস্ত।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক ছিল—কুসংস্কার দিয়ে কুসংস্কারের অবসান ঘটানো যায় কিনা। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে ধারা আর্যসমাজ, আনন্দমঠ, হিন্দুমহাসভার আদর্শে জয়লাভ করেছিল, সে ধারাতে গান্ধীজী রামরাজত্বের আরো গভীর ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। গান্ধীজী অবশ্যই শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরিবর্তন আর জাগরণ বলতে দেশের মানুষের চিত্তের আর চেতনার পরিবর্তনকেই বুঝেছিলেন। মানুষ যখন নিজে তার সমগ্র অস্তিত্বে পরিবর্তিত হবে, তখন নিজেই সে পরিবেশ আর প্রতিবেশের কোন্‌টা কতটুকু বদলাতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হবে। একজন বা চার-পাঁচজন দেশনায়ক ধর্মগুরুর মতো আবির্ভূত হয়ে মানুষের জন্য কতটুকু উন্নতি করতে পারেন? মানুষের চিন্তাচেতনাকে সম্পূর্ণভাবে পারলৌকিকতা-মুক্ত ও সংস্কার-মুক্ত হতে হবে, সবকিছুকে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে। প্রবল মানবতাবোধ এবং প্রখর র‍্যাশনালিটি ছাড়া মানুষ দলে-দলে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে শামিল হবেই বা কীভাবে? একদল ভাগ্যবাদী, স্বর্গসুখকামী, দৈববিশ্বাসী মানুষ আর মুষ্টিমেয় ভাগ্যবাদী, অর্থলোভী, ক্ষমতালিপ্সু, নেতা মিলে কী পরিবর্তন করবেন?

—কিন্তু, বিশ্বের ইতিহাসে যতগুলি বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছে, তাদের কর্মীরা কি একই সাথে সংগ্রামী এবং ধার্মিক নন?

প্রেমানন্দ—পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলনের সমস্ত কর্মীদের ওপর কোনো সমীক্ষা করে দেখা হয় নি। সটা সম্ভবও নয়। তাই, তথ্যটা কতদূর বাস্তব জানা নেই। আন্দোলনকারীরা কেউ-কেউ ভাগ্যবাদী, কেউ-কেউ তা নন। কেউ তাবিচ পরেন, কেউ পরেন না। পরিসংখ্যান বার করা সম্ভব নয়। তাই, তথ্যটা আংশিক সত্য হলেও, এর থেকে কী সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে? কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতায় বিশ্বাসী হলেও ক্ষতি নেই, কারণ, ধর্মান্ধ ব্যক্তিও সংগ্রামী চেতনা হারান না? যাঁরা স্বাধীনতার জন্যে রাজনৈতিক সংগ্রাম করছিলেন, তাঁরাই আবার ১৯৪৬-৪৭-৪৮ সালে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা করেছিলেন; সকলে নন, কেউ-কেউ। আমি তো অবশ্যই দাঙ্গার মানসিকতা ও সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ এবং তারও মূলে ধর্মান্ধতাকে দায়ী করবই। অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রচার আন্দোলন জরুরি ছিল। কারখানায়, অফিসে যিনি মালিকের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তিনি যদি বাড়িতে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেন, সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেন, গৃহভৃত্যের ওপর নির্যাতন করেন, তবে তাঁর ওইসব অন্যায়ের বিরোধিতা করতেই হবে। গরিব বলেই তো একজন প্রতারক ভণ্ডকে বিনা প্রতিবাদেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন সৈন্য দেশের জন্য যুদ্ধ করবে বলে তার নাগরিক দুর্নীতি আর অন্যায়কে মেনে নেওয়া যায় না।

—সম্পূর্ণই সঠিক কথা। তবুও বলছিলাম, সংগ্রামী হবার পূর্বশর্ত হিসেবে কুসংস্কারমুক্ত হবার বিষয়টি সম্পূর্ণ মানা···

প্রেমানন্দ—সংশয় আছে তো? সমাজবিজ্ঞানের কোনো সূত্র, মতবাদ আর পর্যবেক্ষণই চরম সত্য নয়। আমি যা বলছি, তা শেষ কথা নয়। তবু ভেবে দেখুন তো, ইউরোপ,

আমেরিকায় আজ অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক সক্রিয়, অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের গণতান্ত্রিক যোগদানে সংগঠিত এবং তাঁদের দাবিও অনেক উচ্চতর জীবনযাত্রার। তার একটা কারণ, সেসব দেশে শোষণ, অসাম্য, গণতন্ত্রহীনতাই মূল তিনটি সমস্যা, এ তিনটের বিরুদ্ধে লড়াইটাই প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম। কিন্তু ভারতের মতো পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির দেশে উপনিবেশবাদী হস্তক্ষেপ, আর্থিক শোষণ, রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণ যেখানে লড়াইয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে, হিন্দু আর মুসলমানের ধর্মীয় আইডেনটিটি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমস্যা নিয়েই চল্লিশটি স্বাধীনতাদিবস পার করে দেয়, সেখানে ইউরোপে গ্রীনদীন মুভমেন্ট, অ্যান্টিনিউক্লিয়র মুভ, নারী-মুক্তি আন্দোলন, অধিকতর গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি ও আর্থিক সচ্ছলতার দাবিতে আন্দোলন করাটা জনগণের অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে। এ-দেশে প্রতিবাদী নারীদের আন্দোলনের ইস্যু পণপ্রথা, বউ-পেটানো, ধর্ষণ, স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাদি। অধুনা 'সতী' ইস্যুটি যুক্ত হল। আসলে, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ সহ সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি এক্ষেত্রে এত পশ্চাদ্‌মুখী যে, উনিশশতকীয় সতীদাহর বিরুদ্ধে লড়াই করতেও রাষ্ট্রযন্ত্রকে সক্রিয় হতে হচ্ছে ১৯৮৭-তে! যখন সুইডেনে জারমানিতে মেয়েরা নিউক্লিয়র কমপ্লেক্সকে ঘেরাও করছেন, তখন এদেশে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে 'অগ্নিপরীক্ষা' বা আত্মহত্যা!

—'সতী'প্রথার পুনরাবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর ও ভয়াবহ।

প্রেমানন্দ—ঠিক পুনরাবির্ভাব নয়। স্বাধীনতার পর আটত্রিশটি সতীদাহর ঘটনা রেকর্ডেড। বহু সতীদাহর ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছিল, পুলিশ গিয়ে আটকেছে। অথচ ১৮২৯-এ 'সতী'-বিরোধী আইন রচিত হয়েছিল। বিদেশী শাসকরা এ বিষয়ে যে নীতি নিয়েছিল, স্বদেশী শাসকরাও তাই নিয়েছে। প্রগতিশীল সাজতে আইন প্রণয়নও করা হবে, আবার ভোটদেবতার মন মজাতে তাঁদের চটানোও চলবে না। সতীদাহ বা সহমরণের প্রথাটি স্বাধীন ভারতে দু-একটি জাতির মধ্যেই প্রচলিত রয়ে গেছে। সেই জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং সামরিক ভূমিকার কথা রাষ্ট্র জানে। রাষ্ট্র তাঁদের চটাতে চায় না। আর শাসকদলে সেই জাতির ভোটপ্রার্থীরা রয়েছেন। আমার মনে হয়, একুশ শতকে পৌঁছানোর আগে আরো অনেকে সহমৃতা হবেন। আসলে, সতীত্বের ধর্মনৈতিক নারীবিদ্বেষী মতাদর্শটি তো সামাজিকভাবে অতি-সমাদৃত! পুরুষকে 'সং' হতে হয় না তো! মেয়েদের প্রতি এই অবমাননামূলক ধারণাটির সাথে হিন্দুধর্মীয় অনুশাসন, পরলোক-বিশ্বাস, জন্মান্তরবাদ, পতি-পূজার কুসংস্কার, বিধবার প্রতি সামাজিক নিপীড়ন ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েই সতীদাহ। পুলিশ, আইন দিয়ে অবশ্যই ঘটনাগুলো আটকানো যায়। কিন্তু সংস্কার, মূল্যবোধ, প্রথার অবলুপ্তির জন্য দীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক আন্দোলন চাই। যে ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি প্রথা ও বিশ্বাসের উদ্ভব, সে বাস্তবতা অনেকখানি বদলে গেলেও, প্রথাটি টিঁকে আছে।

—আপনার জীবনে মূল প্রেরণা কার?

প্রেমানন্দ— আমার যৌবনের সক্রিয়তা ও সমাজমনস্কতাকে নির্দিষ্ট একটি ক্ষেত্রে যিনি বিশেষিত করে তুললেন, তিনি আব্রাহাম থোম্বা কভুর। এই সিংহলী বিজ্ঞানী কিন্তু কেরালারই সন্তান। আমৃত্যু ইনি দেশভুড়ে সমস্ত জ্যোতিষী, ধর্মগুরু, সাধু-সন্ন্যাসী, প্রতারকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এঁর আদর্শগতর প্রভাব আমাকে অনেকটা সংগঠিত করেছিল। ১৯৬৩ সালে কভুর একলক্ষ সিংহলী টাকা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন এই মর্মে যে, যিনি এই লৌকিক পৃথিবীতে একটিও অলৌকিক ঘটনা প্রমাণ করতে পারবেন, তাঁকে ঐ টাকা দেওয়া হবে। ৭৮ সালে কভুরের মৃত্যু হয়। আজ অব্দিও তাঁর ঐ চ্যালেঞ্জ কেউ জিততে পারে নি। কভুরের এই অনমনীয় যোদ্ধাপ্রতিম অস্তিত্বটি আমাকে নতুন এক সক্রিয়তার জগতে নিয়ে এল। আমি উপলব্ধি করলাম, ঈশ্বরবাদ, ধর্ম, কুসংস্কার তথা মিরাকল্‌কে সমালোচনা করাই যথেষ্ট নয়। দেশের মানুষের কাছে আমাকে যেতে হবে। একটা কাজের সূত্রে।

—আপনি কি প্রথম থেকেই ইনডিয়ান র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে আছেন?

প্রেমানন্দ—নির্দিষ্ট বছরটা মনে নেই, আসোসিয়েশনটি (IRA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০ নাগাদ। ঐ বছরেই আমার জন্ম। সংগঠনের প্রথম থেকে আমার থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৬৯-এ কভুরের উদ্যোগে 'মিরাকল্ একস-পোজার ক্যামপেন' নামে একটি কমিটি তৈরি হল। কভুর কিন্তু IRA-এর প্রতিষ্ঠাতা নন। তিনি IRA-র সদস্য হয়েছিলেন ১৯৫০-র পরে। যাই হোক, ঐ ক্যাম্পেন কমিটির তরফে বিভিন্ন রাজ্যে কিছু সংগঠক পাঠানো হল, ঐসব অঞ্চলে গিয়ে ঘুরেফিরে সব দেখতে, বুঝতে। আমাকে তামিলনাড়ু, কেরালায় পাঠানো হল। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে

জনগণের সাংস্কৃতিক জীবনের খোঁজখবর নিতাম। কোনো মিরাকল্-এর দাবি উঠলে, ইনভেস্টিগেট করতাম। তখনও নিজে শো শুরু করি নি। এরকম নতুন কর্মজীবনের শুরুতেই স্ত্রী মারা গেলেন, ১৯৭০-এ।

—একটু ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা রাখছি। একেবারেই অন্য-রকম জীবন, কাজকর্মের মধ্যে আপনি যাচ্ছিলেন। পরিবারে এ নিয়ে সমস্যা হয় নি?

প্রেমানন্দ—কিছু সমস্যা তো হয়ই। পারিবারিক জীবন-যাত্রায় এর বেশি মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন আছে, প্রত্যেকেরই কিছু স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। ছোটবেলাতেই আমার অস্বস্তি হত পরিবারের কর্তৃত্ব মেনে নিতে। তবে, মা একদমই কর্তৃত্ববাদী ছিলেন না। বাবা তাঁর শাসকের পদটার ক্ষমতা ভালোই ভোগ করতেন। প্রশ্নহীনভাবে বড়োদের কথা মানতে শেখানো হত। শিক্ষকদেরও প্রশ্ন করা যেত না। তখন থেকেই আমার অন্তর্গত প্রতিরোধ জেগে উঠত। তবে, সদ্য যৌবনেও কিন্তু আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম। অবশ্য সাধুবাদের অলৌকিক ভাঁওতায় বিশ্বাস করতাম না। পরে, আমার যখন বিয়ে হয়, তখন সাত বছর ধরে একটা ছোট যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ভালোবেসে বিয়ে। আমার পরিবারকে তো রাজি করিয়েছিলাম। কিন্তু প্রেমিকার বাবা ছিলেন ভয়ঙ্কর গোঁড়া। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কন্যার সম্পূর্ণ হিন্দুধর্মীয় বিয়ে হবে এবং অন্যান্য জাঁকজমক করতে হবে। আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম এসবের। ভাবী স্ত্রীকে বুঝিয়ে আমার বিশ্বাসের পক্ষে নিয়ে আসতে খুব বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু ওর বাবা দীর্ঘ সাত বছর ধরে প্রচুর ঝামেলা করলেন। তারপর রেজিস্ট্রি বিয়েই হল। বুঝতেই পারতাম, এ ধরনের পরিবেশে যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী হিসেবে হোলটাইমার হওয়াটা যথেষ্ট দুঃসাহসিক ব্যাপার। তবে, যখন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, আমি মধ্যযৌবনে। আমার বিয়ে আর কেউ মাথা গলান না। ছেলেমেয়েও হয়েছে। মজার কথা, আমার সন্তানদের অনেক বেশি র‍্যাশনাল হতে দেখেছি। মনে হয়, শিশুরা তাদের বোধগম্য ব্যাপারগুলোয় বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি র‍্যাশনাল আর মানবিক হয়। শিশু মানে বাল্যবয়সটা বলছি। এই মানবিকতা ও সারল্য খুবই মূল্যবান। IRA এবং অন্যান্য র‍্যাশনালিস্ট সংগঠন এবং বিভিন্ন শিল্প-সাহিত্যের সংস্থায় দেখেছি, যথেষ্ট যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও মানবিক কিছু বোধের অভাব।

—আচ্ছা, একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। IRA-তেই তো আপনার এই কর্মজীবনের শুরু। আপনি তো IRA-র পরিচালকমণ্ডলীরও একজন। এই যে বিভিন্ন রাজ্যে প্রোগ্রামে যান, সেটা কি IRA-এর প্রোগ্রাম করতেই—

প্রেমানন্দ—না, IRA-র প্রোগ্রাম করতে যাওয়ার প্রশ্নই এখন ওঠে না। ১৯৮৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন আমাকে ডিসমিস করে। '৮৩ থেকেই সংস্থার সভাপতি আড়ামারাম্বু। এঁর মধ্যে কিছুটা কর্তৃত্বের ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। নির্দিষ্ট একটি পার্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা দিচ্ছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত ছিল। কেউ-কেউ নির্দিষ্ট পার্টির সদস্য বা সমর্থকও ছিল। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ মঞ্চে সবার জন্য দরজা খোলা ছিল। আমাদের কাজ ভোটে দাঁড়ানো নয়। আমরা সামাজিক কিছু সমস্যা, বিশেষত চিন্তাসংস্কারের প্রশ্নে প্রচার আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলাম। এখনও তাই করার চেষ্টা করি। তো, দেখা গেল নেতৃত্বের সাথে কর্তৃত্ব ও heroism মিলে একটা সমস্যা তৈরি হল সংগঠনে। তার-পরই ডিসমিস হলাম। তার কারণ বলাটা অস্বস্তিকর এবং নিষ্প্রয়োজন। ১৯৭৬ এ কেরালা র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসো-সিয়েশন তৈরি হয়। তারও সদস্য হই। কিন্তু, কখনোই অন্ধভাবে মেনে সদস্য থাকি নি। বর্তমানে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সাথে কাজের সংযোগ আছে। এই সংস্থাগুলো অটোনমাস, কেউ IRA-এর শাখা নয়। এঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শাসনকে গুরুবাদী প্রত্যাদেশের মতো নীচের সমস্ত শাখাসংগঠন ও কর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা একেবারেই ঠিক নয়। এ বিষয়ে সতর্ক না হলে ধর্মগুরু বা অহংকারী রাষ্ট্রনায়কের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই।

—গুরুবাদ অবশ্যই বিপজ্জনক। কিন্তু মানবমুক্তির প্রক্রিয়ায় গুরুবাদকে এত বড়ো শত্রু সাব্যস্ত করার যুক্তিটা স্পষ্টতর করবেন?

প্রেমানন্দ—আগেও বলেছি, কীভাবে পরিবারে, শিক্ষাক্ষেত্রে, ক্লাবে, ধর্মালয়ে প্রায় সর্বত্রই একজন শিশু শুধু প্রশ্নহীন আনুগত্য, নিঃশর্ত ভারবহন, প্রথাগত পরম্পরা, বয়স্কদের সৃজনহীন অনুকরণের শিক্ষাই পায়। আমার বাল্যেও তাই ঘটেছে। আজকাল কিছু-কিছু পরিবারে বাবা-মার এই গুরুবাদী অবদমন হ্রাস পাচ্ছে। আনন্দের কথা, আমার

পরিবারেও এই অবদমন কম ছিল। কিন্তু ছিল। আমার স্ত্রীর বাবা তো বদ্ধমূল ছিলেন যে, রেজিস্ট্রি বিয়েটাই খুব কুৎসিত। ধর্মসাক্ষী রেখে, যজ্ঞ করে, মন্ত্র পড়ে, কয়েকশো লোকের উৎসব না করলে বিয়েই হয় না। এ ধারণাটা তাঁর একার নয়, ওই প্রজন্মেরই তা উত্তরাধিকার। অথচ নতুন প্রজন্ম, মানে যারা স্বাধীনতারও পরে জন্মেছে, তাঁরা আকছার রেজিস্ট্রি করছে; আজকাল তো 'লিভ টুগেদার' অর্থাৎ রেজিস্ট্রি না করেও একসাথে বাস করা হচ্ছে। এই প্রগতিটা সম্ভব তখনই, যখন নতুন প্রজন্ম পুরনো পশ্চাৎপদ অমানবিক অনুপযোগী সংস্কার, রীতিনীতিকে বিরোধিতা করার সক্রিয়তা দেখাচ্ছে; আর ওই পুরনো ক্ষতিকর বিশ্বাস আর প্রথাকে বদ্ধমূলভাবে অনুশীলন করেন পুরনো প্রজন্মের বাবা, মা, বয়স্ক আত্মীয়রা, শিক্ষক, ক্লাব বা পাড়ার গুরু, ধর্মগুরু, প্রোচ্ছ রাজনৈতিক নেতারাই। ভাবুন না, চার্বাক, বুদ্ধ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে যে-কোনো বিদ্রোহ, আন্দোলনের কর্মীরা, প্রত্যেককেই পরিবার বা শিক্ষালয় বা কর্মপ্রতিষ্ঠানের অবাধ্য হতে হয়েছে। কখনোই পুরনো সমাজের ধারক আত্মীয়, নেতা বা গুরুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়, এসো তুমি বিদ্রোহ করো। সমাজসংস্কৃতি কিছুই তো অব্যয় নয়। পালটাবেই। নতুন প্রজন্ম যদি পুরনো শাসন ও ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করার সাহস আর প্রয়োজন অনুভব না করে, তবে অচলায়তন ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। ধর্মগুরু বলেন, 'গুরু বিনে জ্ঞান হয় না'! গুরুই ঈশ্বরের দালাল হয়ে ঈশ্বরকে পাইয়ে দেবেন। স্কুলেও শিক্ষকই চূড়ান্ত সত্য জানেন, ছাত্রের অন্য রুচি, সন্দেহ মানেই বেয়াড়াপনা! একটা ছেলে বা মেয়ের পাশফেল তথা চাকরি তথা ভবিষ্যতের চাবিকাঠি, তাকে নিয়ে কী ভয়ানক কর্তৃত্ব যে শিক্ষক করতে পারেন, তা আমি দেখেছি। ক্লাবে বা পাড়াতেও দেখেছি, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুটির প্রশ্নহীন আনুগত্য মেনে স্রেফ চামচাগিরি করে একটি বখাটে ছেলে কীভাবে তার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট করছে। এ প্রসঙ্গে ফিল্মি হিরোদের সর্বনাশা প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ফিল্মের প্রখর সম্মোহ তৈরির ক্ষমতা আছে, যা ধর্মগুরু, ম্যাজিশিয়ানদের চেয়েও বেশি।

আজকের যুবকযুবতী গত শতকের মূল্যবোধ ও রীতিনীতির উত্তরাধিকার বয়ে বেড়াচ্ছে, আবার একই সাথে প্রিয় গুরুর মতো 'আধুনিক' হবার চেষ্টাও করছে। কোনরকম নিজস্বতা ও যুক্তিবিচারই থাকছে না। প্রত্যক্ষভাবে দীক্ষা না দিয়েও একজন হিরো লক্ষ-লক্ষ মানুষকে বিপজ্জনক এক সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করে তুলছেন। এবং অধুনা রাজনীতিতে ফিল্মি হিরোদের অনুপ্রবেশ-বৃদ্ধির মূল সূত্র এটাই। রাজনীতি, ধর্ম আর ফিল্ম—এই তিনের অদ্ভুত কোলাবরেশন ঘটেছে। এই তিন ক্ষেত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য—তিন ক্ষেত্রের নেতারাই জনগণকে স্বপ্ন দেখায়, প্রশ্নহীন আনুগত্য ও বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়, যুক্তিবিচার বিস্মৃত হয়ে শুধু গুরুর কথা আর আচরণের অনুকরণ করতে শেখায়। এঁদের তুলনায় পরিবার ও শিক্ষালয় অনেক কম বিপজ্জনক।

—একটা জনপ্রিয় চালু অভিযোগ উল্লেখ করছি। অভিযোগটা এই যে, যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানমনস্ক সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমকালীন দেশীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল ঘটনাপ্রবাহকে ছুঁতে পারে না, ফলে কোনো দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারে না।

প্রেমানন্দ—প্রশ্নটাই গোলমেলে। তবু মন্তব্য করছি। অস্বীকার করছি না, দেশব্যাপী কোনো গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে যুক্তিবাদী বা পিপলস সায়েন্স গ্রুপগুলো পারে নি। সম্ভবত, সেরকম কোন দাবিও তারা করে নি। ছোট-ছোট অঞ্চল ধরে ছুটো-একটা ইস্যু ধরেই তাদের কাজ। তারা রাজনৈতিক সংগঠনও নয়। নিপীড়িত শ্রেণীর জীবিকার আন্দোলনেও তারা সেভাবে যোগ দেওয়ার চিন্তা করে নি। কিন্তু সমকালীন দেশীয় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে যুক্ত হওয়ার মানে? মুসলিম নারীর বিবাহবিচ্ছেদ সমস্যা, হিন্দু-নারীর সতীপ্রথা, বাবরিমসজিদ বিতর্ক, তামস ও সাম্প্রদায়িকতা, মীরাটে সংখ্যালঘু হত্যা, পরিবেশ-দূষণ, নিউক্লিয়ার অস্ত্র ইত্যাদি সমকালীন ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এইসব ছোটো সংগঠন কিন্তু সাধ্যমত পজিটিভ ভূমিকা নিতে চেষ্টা করেছে।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

(২৬ ডিসেম্বর, ১৯২১—১৫ জুন, ১৯৮৮)

অমলেন্দু দে

দেশভাগের আগে আর পরে পূর্ববঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চলে রবীন্দ্রভাবনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার যে সচেতন প্রয়াস ফরিদপুর (অধুনা শরীয়তপুর) জেলার বালুচর গ্রামের ঘটক চৌধুরী পরিবার করেন, তার কথা এই বাঙলার কম লোকই জানেন। জমিদার সূর্যকান্ত ঘটক চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী। তিনি মাঝে-মাঝে শান্তিনিকেতনে যেতেন। তাঁর পারিবারিক গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের সব রচনাই সযত্নে সংগৃহীত ছিল। বাঙলা আর ইউরোপীয় সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থও তিনি সংগ্রহ করেন। সূর্যকান্ত তাঁর দুই পুত্রকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠান। একসময়ে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্ররূপেও এই পরিবারের খ্যাতি ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়-ভাবে যোগ দেওয়ার জন্য সূর্যকান্ত কারাবরণও করেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট —উভয় রাজনীতির সঙ্গেই এই পরিবারের যোগ ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও এক ভয়ানক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এই পরিবার রবীন্দ্রভাবনার সলতেটিকে প্রজ্বলিত রাখার জন্য কঠিন সংগ্রাম করেন। সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্ ও সমাজ-সেবী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী এই ঐতিহ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

১৫ জুন, ১৯৮৮। সকালে ঢাকার মোহাম্মদপুরে মেয়ের বাড়িতে রথীন্দ্র-কান্ত কথা বলছিলেন কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে। বেলা এগারোটার সময়ে তিনি শারীরিক অস্বস্তি বোধ করেন। তখনই তাঁকে হৃদ্‌রোগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই দুপুর দুটোয় তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৬ জুন লনচে করে ঢাকা থেকে তাঁর মৃতদেহ জন্মস্থান বালুচরে নিয়ে আসা হল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লনচঘাটে অসংখ্য মানুষ মেঘবৃষ্টি উপেক্ষা করে সমবেত হন। ১৯ জুন শরীয়তপুরে রথীন্দ্রকান্তের উদ্দেশে এক বিশাল স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলি হাওলাদার।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সঙ্গে রথীন্দ্র-কান্ত প্রথম শান্তিনিকেতন বেড়াতে গেলেন। তখন তাঁর বড়দাদা রবীন্দ্রকান্ত শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের ছাত্র ছিলেন। কবিগুরুর 'স্পেশ্যাল বেঙ্গলি ক্লাশে' যে চারজন ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রবীন্দ্রকান্ত। ১৯৩৯ সালে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে রথীন্দ্রকান্তও শিক্ষাভবনে (কলেজ) যোগ দেন ছাত্ররূপে। রথীন্দ্রকান্ত প্রায় তিন বছর শান্তিনিকেতনে ছাত্র-জীবন যাপন করেন। বয়সে পুলিনবিহারী সেন অনেক বড়ো হলেও তাঁর সঙ্গে রথীন্দ্রকান্তের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবনেই 'প্রবাসী' পত্রিকায় রথীন্দ্রকান্তর কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর তিনি পূর্ব-বাঙলার নিজ গ্রামে ফিরে যান।

তারপর রথীন্দ্রকান্ত একটানা প্রায় এগারো বছর সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। অবশ্য ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তিনি "অনুশীলন" দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রথীন্দ্রকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। তখন থেকে একই সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চা আর সমাজরূপান্তরের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। ফরিদপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতারূপে তাঁকে অনেক দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। তিনি পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন জেলার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের নেতা। তখন তাঁর রচনা "অভিযান", "অগ্রণী", "অরণি" ইত্যাদি সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হত। তিনি তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে আর্ত মানুষের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৩৫০ সালের ৩০শে ফাল্গুন কোরকদি গ্রামে জেলার কিষাণ সম্মেলন উপলক্ষে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তাতে রথীন্দ্রকান্ত "লাঠিখেলা" নামে একটি কবিতা রচনা করে পাঠ করেন। এই কবিতাটি কিষাণ ফ্রন্টের কর্মীদের খুবই অনুপ্রাণিত করে; তাঁরা কবিতাটি কপি করে নিজ-নিজ অঞ্চলে নিয়ে যান। কবিতাটি বেশ বড়ো। তার শেষ চার লাইন ছিল—

ধুঁকে ধুঁকে সারা বাংলা মরেনি
আজও—

আজও জীবনের অবাধ উৎস জাগে—
আজও বেঁচে আছে বাংলার
লাঠিয়াল—
বাংলা মরবে এ-কথা প্রলাপ শুধু।

দেশভাগের পরেই পূর্বপাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির উপর যে প্রচণ্ড আঘাত নেমে আসে তাতে ঘটক চৌধুরী পরিবারও বিপর্যস্ত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হয়। রথীন্দ্রকান্ত আত্মগোপন করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় কাটান। তখন তিনি "অভিধারা" নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেতা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রথীন্দ্রকান্ত দেশে ফিরে যান। তিনি পূর্বপাকিস্তানে থাকারই সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ভয়ানক প্রতিকূল পরিবেশে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির আঙিনা থেকে সরে আসতে হয়; শিক্ষকতা, সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবায় নিজেকে তিনি নিয়োজিত রাখেন। তিান গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন এবং আরও কিছু গঠনমূলক কাজ শুরু করেন। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ধারা-টিকে সজীব করার জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াস তাঁর অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রভাবিত করে। তিনি জেলার শিল্পকলা একাডেমীর সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। বহু তরুণ মুসলমান তাঁর সংস্পর্শে এসে পরিচ্ছন্ন মননের অধিকারী হন। এই সময়েই রথীন্দ্রকান্ত গভীর-ভাবে রবীন্দ্রচর্চায় নিমগ্ন হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের "হোক ভারতের জয়" নামে কবিতাটি আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত দ্বিতীয় কবিতা। তাছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের "চিঠিপত্র" প্রথম খণ্ডের কয়েকটি চিঠির মুদ্রিত তারিখের ভুল সংশোধন করে দেন।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপটেমবর পুলিনবিহারী সেন চিঠিতে রথীন্দ্র-কান্তকে লেখেন: 'চিঠিপত্র ১ম খণ্ড।··· তারিখ সংক্রান্ত আপনার প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি পাঠিয়ে বিশেষ উপকার করেছেন, আগামী সংস্করণে এগুলি সংশোধিত হবে।...আপনি কলকাতায় থাকলে আমাদের কাজে আপনার সাহায্য পাওয়া যেতে পারত।' রথীন্দ্র-কান্তর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের একটি দুষ্প্রাপ্য কপি ছিল। তাও তিনি পুলিনবিহারীকে পাঠিয়ে দেন। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭ নভেমবর পুলিনবিহারী রথীন্দ্রকান্তকে চিঠিতে লেখেন: 'আপনার ২২শে কার্তিকের চিঠি ও তৎসহ পুস্তিকাটি পেয়ে যারপর-নাই সুখী হয়েছি। রচনাটি অবশ্য লুপ্ত হয় নি, তৎকালে প্রবাসীতেও বেরিয়ে-ছিল; কিন্তু এটি যে স্বতন্ত্র পুস্তিকা-কারে বেরিয়েছিল এ আমার কাছে নূতন সংবাদ, আপনার কাছেই জানলাম। Bibliographyতে যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে (উৎসাহী লোক মুষ্টিমেয়, বিশেষ রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকও রচনাটি পেলেই স্বভাবত খুশী, কুলজির সন্ধান নিষ্প্রয়োজন) এরকম পুস্তিকা পাওয়া অসামান্য ঘটনা। যার যাতে রুচি। ···দূর থেকে এইরকম সাহায্য মাঝে-মাঝেই করতে পারবেন; কিন্তু কলকাতায় থাকলে নিয়তই আপনার সাহায্য পেতে পারতাম। তারিখ সংগ্রহ ইত্যাদির ব্যাপারে মনে হচ্ছে আপনি সাহিত্যিক হলেও এইসব খুঁটিনাটিতেও আপনার রুচি আছে—বেশী লোকের নেই, থাকবে আশাও করা যায় না—এ কাজে তো জৌলুষ নেই।' পুলিনবিহারী রথীন্দ্রকান্তকে তাঁর কাছে রেখে রবীন্দ্রচর্চার কাজে নিয়োজিত করতে চান। কিন্তু ব্যক্তি-গত অসুবিধার জন্য রথীন্দ্রকান্তের সে সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

রথীন্দ্রকান্ত ৩০০০ কবিতা, ২৫০ প্রবন্ধ, ১২৫ ছোটোগল্প এবং বেশ কিছু নাটিকা, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: "পূর্বাপর" (কাব্যগ্রন্থ), "ঝরাপাতা" (গল্পগ্রন্থ) এবং "কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত" (প্রবন্ধ)। তাঁর "সুকান্তের হস্তাক্ষরে কবিতার পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থখানি সুকান্তচর্চাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে। কিভাবে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য-লিখিত "ছাড়পত্র" কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন, আর কিভাবে চল্লিশ বছর ধরে একে রক্ষা করেন, তার ইতিহাস এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আলোচনা করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার সুকান্তর কবিতার পাণ্ডুলিপি নিতে চায়, কিন্তু রথীন্দ্রকান্ত বাংলাদেশেই এই মূল্যবান সম্পদ রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সবাইকে নিয়ে যখন তিনি পশ্চিম-বাঙলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সুদীর্ঘ ন মাস সুকান্তর পাণ্ডুলিপিসহ তাঁর মূল্যবান সংগ্রহশালাটি এলাকার মানুষ রক্ষা করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আবার তিনি স্বদেশে চলে গেলেন। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে তাঁর অঞ্চলের সকল মানুষের এমন গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করেন যে, তাঁরা তাঁকে প্রায় ছাব্বিশ বছর তাঁদের এলাকার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। মানুষজনের প্রতি

অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যই এই গৌরব তিনি অর্জন করেন।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি নিয়ে রথীন্দ্র-কান্ত "রবীন্দ্রতরুমূলে" নাম দিয়ে যে গ্রন্থখানি লেখেন তা ঢাকার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের' উদ্যোগে অগস্ট মাসেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর স্নেহভাজন লেখক কায়েস আহমেদ তাঁকে আত্মজীবনী লেখবার জন্য বারে বারে তাগাদা দেন। তাঁর লেখবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু অযুক্ত রয়ে গেল তাঁর শান্তিনিকেতন-পরবর্তী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পড়ে রইল তাঁর নানা সময়ের লেখা ডায়েরি আর রচনাবলী, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা চিঠি, দুর্লভ পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ, প্রাচীন পারিবারিক গ্রন্থাগার এবং পিতা সূর্যকান্ত ঘটক চৌধুরীর ডায়েরি। হয়তো কোনো এক সময়ে বাংলাদেশের কোনো এক সুযোগ্য গবেষক এই স্বর্ণ-খনিতে প্রবেশ করে এই সংস্কৃতিমান পরিবারে বেড়ে-ওঠা, বিকশিত-হওয়া রথীন্দ্রকান্তর জীবনের অভিজ্ঞতার আর তাঁর কালের একটি স্বচ্ছ চিত্র তাঁর দেশবাসীকে উপহার দেবেন।

মতামত

জুলাই (১৯৮৮) মাসের 'চতুরঙ্গে' মনসুর মুসার "বঙ্কিমে পাশ্চাত্য প্রভাব : ভাষাপরিচর্যার প্রেক্ষিত" প্রবন্ধটি তথ্য-সমৃদ্ধ এবং সুলিখিত। কিন্তু দু-একটা জায়গায় বোধহয় তাঁর ব্যবহৃত ভাষা কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, (১) ২১৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : 'বঙ্কিম ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। "প্রথম গ্রাজুয়েট" আরো কেউ-কেউ ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম ছিলেন "বেস্ট অব দি লট"—দঙ্গলের সেরা।'—এখানে 'প্রথম গ্রাজুয়েট আরো কেউ-কেউ' ছিলেন—এ থেকে মনে হতে পারে, যে 'প্রথম গ্রাজুয়েট' দুজন নয়, কয়েকজন ('কেউ-কেউ') ছিলেন। বস্তুত, মুসা সাহেবের অজানা থাকার কথা নয়, বঙ্কিম ছাড়া আর শুধু একজনই 'প্রথম গ্রাজুয়েট' ছিলেন—যদুনাথ বসু বা সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে—Judoonath Bose। সুতরাং 'প্রথম গ্রাজুয়েট'-দের কোনো 'দঙ্গল' ছিল না। দু-জন দিয়ে তো আর দঙ্গল হয় না! তবে পরীক্ষার জন্যে নাম লেখান এক 'দঙ্গল' (১৩ জন), পরীক্ষায় উপস্থিতও হন এক 'দঙ্গল' (১০ জন), কিন্তু 'প্রথম গ্রাজুয়েট' হয়ে বের হয়ে আসেন মাত্রই দুজন!

(২) বহরমপুরে চাকুরিরত অবস্থায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার বিবরণে মুসা সাহেব লিখেছেন—'ডাক্সিনের সঙ্গে তাই নিয়ে ঘুষাঘুষি করেছেন···ডাক্সিনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে জিতেছেন।'

—ডাক্সিনের সঙ্গে বঙ্কিম 'ঘুষাঘুষি করেছেন' বলাটা বোধহয় একটু অতিশয়োক্তি হয়ে গেছে। বঙ্কিম ডাক্সিন-কর্তৃক 'লাঞ্ছিত' হয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও করেন। কিন্তু সে মোকদ্দমার ধরনধারন আর-পাঁচটা মোকদ্দমার মতো ছিল না। বঙ্কিমের পেছনে সমস্ত বহরম-পুর শহর এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ফলে ডাক্সিন তার পক্ষ হয়ে মোকদ্দমা চালাবার জন্যে একজন আইনজীবীকেও রাজি করাতে পারে নি, এবং বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ এক অসাধারণ মোকদ্দমা জেতা।

(৩) দু-তিনটে ফরাসি নামের উচ্চারণ মুসা সাহেব বড়োই নিজস্ব ভাবে দেখিয়েছেন—যেমন Lille-কে দেখিয়েছেন 'লিলে', হবার কথা লিইল্ (বা লীল্); Marseilles-এর উচ্চারণ দেখিয়েছেন 'মারসেল', হবে 'মার্সেই'। তবে Richelieu নামটির উচ্চারণ বাঙলায় দেখানো কঠিন, কিন্তু 'রিশলু' নয়, অনেকটা 'রিশ্‌লিয়ো'।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি বিখ্যাত নামের উচ্চারণ নিয়ে লিখছি। এপ্রিল মাসের 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে এক জায়গায় মঞ্জুষ দাশগুপ্ত Gothe (বা Göthe) নামের "গ্যোতে" এই 'উচ্চারণই সমর্থনযোগ্য' লিখেছেন। প্রকৃত-পক্ষে ওই নামটির umlaut-যুক্ত o বা ö (যেটাকে সহজ করে লেখা হয় 'oe')=ফরাসি dipthong 'eu'। এই ফরাসি dipthong (eu)-এর সঠিক উচ্চারণের নির্দেশ এরকম—'with rounded lips, pronounce 'a'। এ নির্দেশ মানলে eu বা Goethe নামের 'oe (বা ö)-এর উচ্চারণে 'ও' ধ্বনি আসবে না। Göthe বা Goethe নাম-টির উচ্চারণ 'এ'-ঘেঁষা 'গ্যেতে'—এরকমই হবার কথা।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী। নদীয়া

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ, ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।